KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 7/1 7/2 7/5 7/6	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ ভাদ্র ১৩২৭ আশ্বিন ১৩২৭
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকের নিবেদন।

—:*:—

সবুজপত্র যেমন করেই হোক্ আরো এক বৎসর বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে আমরা বাধ্য।

একটা নবযুগ তার আনুসঙ্গিক নানারূপ আশা বিভীষিকা সঙ্গে নিয়ে আমাদের দুয়োরে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে কি ভাবে আমরা ঘরে তুলে নিই—আদরে না অবহেলায়, আনন্দে না আশঙ্কায়, তার উপর আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করবে। আমাদের মত যারা এই নবযুগের উদ্গাতা তাদের পক্ষে এ সময়ে নীরব থাকা অসম্ভব।

অতঃপর এ দেশে যে ডিমোক্রাসির সূত্রপাত হল, সে বিষয়ে আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। যাঁর আছে, হয় তিনি ডিমোক্রাসির অর্থ বোঝেন না, নয় তাঁর দূরদৃষ্টি নেই। এর উত্তরে পূর্ব্ব পক্ষ নিশ্চয়ই বলবেন যে আমরা চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখছি। এ উত্তরের প্রত্যুত্তরে কিছু বলা অনাবশ্যক। এক পক্ষের কাছে যা অস্তি আর এক পক্ষের কাছে যদি তা নাস্তি হয় তাহলে হাজার তর্কে সে দু'পক্ষের মতের মিল কিছুতেই হতে পারে না। শুধু ধর্ম্মে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আস্তিক ও নাস্তিক, দুটি বিভিন্ন জাতের লোক। এদের পরস্পরের মূল প্রভেদ হচ্ছে প্রকৃতিগত।

স্বজাতির পলিটিক্যাল-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আস্তিক। আমি

অধিকার বিস্তার কর্‌বার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ কর্‌তে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালবাসা, নূতন কর্ত্তব্য ও নূতন চিন্তা, নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবন-প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।

এ যৌবনের কপালে রাজটীকা দিতে আপত্তি করবেন, এক জড়বাদী, আর এক মায়াবাদী; কারণ এঁরা উভয়েই এক মত। এঁরা উভয়েই বিশ্ব হতে তার অস্থির প্রাণটুকু বার করে দিয়ে, যে এক স্থিরতত্ত্ব লাভ করেন, তাকে জড়ই বল, আর চৈতন্যই বল, সে বস্তু হচ্ছে এক,—প্রভেদ যা, তা নামে।

বীরবল।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকের নিবেদন।

—:*:—

সবুজপত্র যেমন করেই হোক্ আরো এক বৎসর বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে আমরা বাধ্য।

একটা নবযুগ তার আনুসঙ্গিক নানারূপ আশা বিভীষিকা সঙ্গে নিয়ে আমাদের দুয়োরে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে কি ভাবে আমরা ঘরে তুলে নিই—আদরে না অবহেলায়, আনন্দে না আশঙ্কায়, তার উপর আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করবে। আমাদের মত যারা এই নবযুগের উদ্গাতা তাদের পক্ষে এ সময়ে নীরব থাকা অসম্ভব।

অতঃপর এ দেশে যে ডিমোক্রাসির সূত্রপাত হল, সে বিষয়ে আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। যাঁর আছে, হয় তিনি ডিমোক্রাসির অর্থ বোঝেন না, নয় তাঁর দূরদৃষ্টি নেই। এর উত্তরে পূর্ব্ব পক্ষ নিশ্চয়ই বলবেন যে আমরা চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখছি। এ উত্তরের প্রত্যুত্তরে কিছু বলা অনাবশ্যক। এক পক্ষের কাছে যা অস্তি আর এক পক্ষের কাছে যদি তা নাস্তি হয় তাহলে হাজার তর্কে সে দু'পক্ষের মতের মিল কিছুতেই হতে পারে না। শুধু ধর্ম্মে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আস্তিক ও নাস্তিক, দুটি বিভিন্ন জাতের লোক। এদের পরস্পরের মূল প্রভেদ হচ্ছে প্রকৃতিগত।

স্বজাতির পলিটিক্যাল-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আস্তিক। আমি

স্বজাতির মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি এবং বিজাতির মনুষ্যত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করি নে। এইজন্যে আমি তাঁদের বলি নাস্তিক, যাঁরা স্বজাতির মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করেন না, এবং বিজাতির মনুষ্যত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন। আমাদের এই বিশ্বাস ও তাঁদের এই অবিশ্বাস কোন পক্ষই তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না, কেননা এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই দুটি অজানা জিনিষ নিয়ে কারবার করছেন, প্রথম জাতীয় আত্মা, দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ কাল।

আমাদের কথা হচ্ছে এই যে উক্ত বিশ্বাসই হচ্ছে আমাদের সকল বলা-কওয়ার আসল ভিত্তি। ও-বিশ্বাস ত্যাগ করলে আমাদের পক্ষে মৌনব্রত অবলম্বন করে নির্ব্বাণমুক্তির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, এই ডিমোক্রাসি শব্দের অর্থ কি?—

একটা জাতির ভিতর এক এক যুগে এক একটি কথা ওঠে বা হাওয়ায় উড়ে আসে, যা সকলের মুখেই শোনা যায়, আর যা সকলের মনকেই আকৃষ্ট করে, সে সব কথার স্পষ্ট অর্থ বোঝানো অসম্ভব। আমার দার্শনিক গুরু Bergson বলেন, সে অর্থ বোঝানো যেমন অসম্ভব, জনগণের পক্ষে তা বোঝাও তেমনি অনাবশ্যক। কেননা সে সব কথার প্রকৃত অর্থ অভিধানের মধ্যে নেই, আছে জীবনের অভিব্যক্তির মধ্যে। এ জাতীয় কথা যে ধাতু থেকে উৎপন্ন হয় সে ধাতু হচ্ছে প্রাণ। লোকের যদি বিশ্বাস থাকে যে ডিমোক্রাসির অর্থ তারা বোঝে ও সে পদার্থে তাদের আস্থা থাকে তাহলেই তারা ডিমোক্রাসি গড়ে তুলতে পারবে। এ আস্থাই হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্বের

উপর বিশ্বাস। তার পর ডিমোক্রাসি কোনো দেশেই পড়ে-পাওয়ার জিনিষ নয়, সব দেশেই গড়ে তোলবার জিনিষ। এবং সেই জন্যই ডিমোক্রাসি শব্দের প্রতি ভাষায় অর্থ স্বতন্ত্র, কেননা প্রতি জাতি ও-বস্তু নিজের মন ও প্রাণ দিয়ে গড়ে তোলে। আর যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তেমনি জাতিতে জাতিতেও মনপ্রাণের অল্প বিস্তর পার্থক্য আছে। যেদিন আমরা ডিমোক্রাসি গড়ে তুলতে পারব সেই দিন ও-শব্দ বাঙলা হয়ে উঠবে, তখন তার মানে জানবার জন্যে আমাদের ইংরাজি অভিধানের আর সাহায্যে নিতে হবে না। ডিমোক্রাসির অর্থ একটা বিশেষ রকমের শাসনতন্ত্র মাত্র নয়, ও-বস্তু হচ্ছে একটা জাতির আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের একটা পরিণত রূপ।

আমরা এই স্বদেশী ডিমোক্রাসির গঠনকার্য্যে নিজ শক্তি নিয়োজিত করব, অবশ্য একমাত্র কথা কয়ে। কিন্তু কারো ভোলা উচিত নয় যে কথাও হচ্ছে এক রকম কাজ—অবশ্য সে কথার ভিতর যদি আন্তরিকতা থাকে।

বিলেতি ডিমোক্রাসির যে-সকল নমুনা আমাদের চোখের সুমুখে রয়েছে তা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরও নয়, সর্ব্বগুণে গুণান্বিতও নয়। স্বরাজ্য কোনো দেশেই স্বর্গরাজ্য নয়। শাসনতন্ত্র হিসেবে ডিমোক্রাসি হচ্ছে প্রথমত কথার রাজ্য। সংবাদ-পত্র ও বক্তৃতা এ তন্ত্রের দুটি শক্তিশালী অঙ্গ। যে দেশে এ তন্ত্র আছে সে দেশে কথার আর অন্ত নেই। "সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর"—ভারতচন্দ্রের এ উক্তি, ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। সুতরাং দুদিন পরে দেখা যাবে যে, দেশের আকাশ মিছে কথার কুয়াসায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তার পর

ডিমোক্রাসি সম্প্রদায়িক দ্বেষহিংসার অত্যন্ত প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু ডিমোক্রাসির সব চাইতে সর্ব্বনেশে দোষ এই যে, এ তন্ত্রে বৈশ্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণবুদ্ধির স্থানকে অধিকার করে। কেননা শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণ হওয়ার চাইতে বৈশ্য হওয়া ঢের বেশি সহজ। শুধু তাই নয়, এ তন্ত্রে বৈশ্যেরাই শূদ্রের বেনামিতে দেশের লোকের উপর প্রভুত্ব করে। ফলে ভাবে ও ভাষায়, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে এ তন্ত্রের সহজ ঝোঁক ইতরতার দিকে। সুতরাং একদিকে ডিমোক্রাসি গড়ে তোলবার সাহায্য করা যেমন আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য আর একদিকে এই মিছে কথা, এই দ্বেষহিংসা এই বৈশ্যবুদ্ধি এই ইতরতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাও আমাদের পক্ষে তেমনি কর্ত্তব্য এবং সে অস্ত্র হচ্ছে সাহিত্য। রূপ-লোকের সন্ধান না পেলে মানুষে কামলোকের মায়া কাটাতে পারে না। সাহিত্য অবশ্য এই রূপলোকের কথাই মানুষকে শোনাতে চায়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অশান্তের দল।

——:০:——

পূর্ব্বাচল হ'তে আজি এসো নিয়ে এসো
স্বর্ণ রশ্মি-জাল,
ভূষিত করিয়া দাও কনকভূষণে
লজ্জা-নত ভাল।
স্কন্ধে লয়ে কে ফিরিবে দ্বারে দ্বারে দ্বারে
ভিক্ষা-করা ঝুলি ?
করুণার সুরে বাঁধা লজ্জাহীন মুখে
কাতরতা-বুলি ?
পূর্ব্বাচল হ'তে নিয়ে স্বর্ণ রশ্মিমালা
কর কর ভূষা,
আঁধারের শেষে আজি সাগরের নীরে
ওই জাগে ঊষা !

উদয় অচলে আজি ওই জাগে ঊষা ;
অশান্তের দল,
কোন্ বেশ পরি' তোরা বিশ্বরাজ-পথে
বাহিরিবি বল্ ?
বক্ষপাশে জাগিবে কি অদম্য উল্লাসে
জীবনের সুখ ?

সীমাহীন দিগন্তের আলো স্বপ্ন দিয়া
ভরিবে কি বুক ?
সপ্তসিন্ধু-বুকে-ফেরা এনো যে বাতাস
অশান্তের দল !
তারে কি ধরিবি আজি তোর বক্ষপুটে
বল্ ওরে বল্ ?

কে রহিবে ওরে আজি কে রহিবে ঘরে
শান্ত অন্ধ মূক !
আজি যে এ ধরিত্রীর প্রতি রন্ধ্রে জাগে
অদম্য কৌতুক !
দিগন্তের কোণে কোণে নিমেষে নিমেষে
ওঠে তার হাসি,
সপ্তসিন্ধু বুকে বুকে কার বাজে ওই
আমন্ত্রণ বাঁশী !
চরণ রহে না আর—অশান্ত চরণ
রুদ্ধ দ্বার ঘরে,
আজি যে বিশ্বের রাজা ডাকে বাহিরিতে
বরাভয় করে !
আয় আজি আয় ওরে অশান্তের দল
ছাড়ি মিথ্যা ভয়,
সপ্তসিন্ধু-কূলে কূলে গাব জীবনের
জয় জয় জয় !

অনন্ত গগন পানে দিব দিব মেলি
এই ক্ষুদ্র হাত,
পারি না পারি না আজি করিব রে ভয়
বজ্র অকস্মাৎ—
আকাশের তারা ছিঁড়ি কণ্ঠহার গাঁথি
পরিব গলায়,
ভয় যে লাগে না প্রাণে উল্কা হ'য়ে যদি
ভস্ম করি যায়,—
চাঁদিমার রৌপ্য কাড়ি' গড়িয়া কিরীট
দিব শিরোপরি,
অদম্য পুলক বুকে কেমনে বাঁধিব
শঙ্কা ছল করি' ?
উদয়-অচলে আজি জাগে স্বর্ণ উষা
জীবন মোহন,
রে অশান্ত আয় ছুটি বিশ্বপথে পরি'
বীরের ভূষণ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পত্র।

শ্রীযুক্ত "সবুজপত্র" সম্পাদক মহাশয়

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

আমার বড় অহঙ্কার যে সবুজ-পত্রের মধ্যে আমিও একটি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহুদিন আপনি এই পত্রটির কোন খোঁজ নেন নাই। আমিও আপনার কোন খোঁজ নিতে পারি নাই; কেননা আমার এতদিন 'নিজের খোঁজই কে-নেয়' এই অবস্থা ছিল। এই অবস্থার শেষে এবং বসন্তের প্রথমে আপনার খোঁজ নেবার কথা প্রাণে প্রাণে বোধ করিলাম।

আমাদের দুই ভাইয়ের, প্রথমটির নাম তুলসী পত্র বা তুলসী পাতা, দ্বিতীয়টির নাম বিল্বপত্র বা বেলের পাতা। দ্বিতীয়টি আমি, আমিই বিল্বপত্র। দুইটি ভগ্নীও—করবী ও অতসি। শক্তি-উপাসক-দম্পতীর, আদরের নামই পাইয়াছিল। কিন্তু আমার কথাটাই আমি বলিব।

বিল্বপত্র বা বেলের পাতার তিনটি অংশ,—একটি সাম্য, একটি মৈত্রী আর মধ্যেরটি উচ্চশির সুতরাং স্বাধীনতা; একটি সত্ত্ব, একটি তমঃ, মধ্যেরটি একই কারণে রজঃ; একটি সৃষ্টি, একটি লয় মধ্যেরটি মধ্যাবস্থা সুতরাং স্থিতি ইত্যাদি বহুপ্রকারে ঐ তিন অংশের

বা দলের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার দুর্দ্দশার সীমা নাই। ব্যাপারটা শুনুন।

উচ্চকুলে জন্ম, দেবতার পূজায় লাগি,—কাজেই মধ্যের দলটি অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম আমার সঙ্গে তুলনা কার? শৈশবের কচি রঙ কচি বয়স, নব বসন্তের মধুর বাতাস—প্রাণ উল্লাসে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। কুক্ষণেই স্খলিত বা স্খলিতপ্রায় পাণ্ডু-পত্রদিগকে উপহাস করিয়াছিলাম! একটা ঘূর্ণিবায়ুতে কতকগুলি ধূলি বালির সহিত মিশিয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে তাহারা আমাকে অভিশাপ দিয়া গেল। তখন তাহা গ্রাহ্য করি নাই, ক্রমে দেখি তাহা ফলিল।

একদিন একজন আমাকে তুলিতে আসিল। শিহরিয়া উঠিলাম, হায়! পরের পূজা পরাধীনতা"! মধ্যের পাতাটি নম্র হইয়া আসিল। সাম্য ও মৈত্রী বলিল "দোষ কি? সবাই সমান, সবাই পূজার পাত্র"। যে আসিয়াছিল সে ছাড়িল না। তুলিয়া লইল। স্বাধীনতা আশ্বাস মানিল যে স্বেচ্ছায় পরের পূজা করায় পরাধীনতা নাই, অনিচ্ছায় পরসেবাতেই পরাধীনতা।

পূজার আয়োজন হইল। পূজা সরস্বতীর। আমাকে তুলিয়াছিল স্কুলের ছেলেরা। বেলের পাতার ডালায় চোখ মেলিয়া দেখি সাম্য ও মৈত্রী মলিন মুখ। স্বাধীনতা অভিমানে গর গর করিতেছে। সাম্য ও মৈত্রী সমস্বরে বলিল, "এ'ত সরস্বতীর পূজা নয়, দুষ্টা সরস্বতীর পূজা। কেননা যাহারা পূজা করিতেছে তাহারা বাহিরে জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ লইয়া বিষম তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে, মারামারি বুঝি একটা হয়।

ব্রাহ্মণ কায়স্থেতর জাতিরা মণ্ডপে প্রবেশ করিতে পারিবে না, আর, একটি মুসলমান মণ্ডপের কাছে আসিয়াছিল বলিয়া গলাধাক্কা খাইয়াছে।" স্বাধীনতা বলিল "এ পূজায় আমি থাকিব না"! সাম্য ও মৈত্রী বলিল "এখন ছাড়ে কে"? হঠাৎ দেখি ডালা উল্টাইয়া মেজেতে পড়িয়া গিয়াছি। ভাবিলাম ভালই হইল। তখনই একটি বালক শশব্যস্তে আসিয়া আমাকে ডালায় তুলিয়া দিল। বিরক্ত হইলাম। কিন্তু ঠাণ্ডা হইলাম বালকটির ঐ স্পর্শে। সে স্পর্শে কত যত্ন কত আগ্রহ।

পূজা চলিতেছিল। ফুলগুলি আমার মনের কথা জানিয়া থাকিবে। তাহারা বলিল "এখানে আর স্বাধীনতার বড়াই খাটে না, সাম্য মৈত্রীর বড়াই খাটে না। পরাধীনতা যখন স্বীকার করিয়াছ তাহার শেষ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হও"। পুরোহিত কি যেন মন্ত্র পড়িয়া বড় বড় গাঁদা ফুল গুলিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেবীর পায়ে দিতে লাগিল। ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ধূপ ধূনা জ্বলিতে লাগিল। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল এ'ত পূজা নয়, এ আমাদের বলি। ইতিমধ্যে কে যেন আমার গায়ে চন্দন মাখাইয়া দিল। চন্দনের মাধুর্য্য বিশেষ কিছু বোধ করিতে পারিলাম না,—একটা শীতল কম্পন শিরায় উপশিরায় বহিয়া গেল। যখন কয়েকটি বালক আমাকে ছিন্ন ভিন্ন ফুলের দলের সহিত অঞ্জলির মধ্যে পূরিল তখন আমি অবসন্ন, দুঃখ বেদনা তখন আর নাই। তাহারা মন্ত্র পড়িয়া আমাকে প্রতিমার দিকে নিক্ষেপ করিল। আমি কাঠামের একটি বাঁশের গায়ে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। কোথায় বা দেবী, কোথায় বা পূজা। বুঝিতেও

পারিলাম না। দুই দিন পর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে দেখিতে পাইলাম কয়েকটি ফুলের দল, একটু ভস্ম, একটু কাদা, একটু ধূনা, এই সবের মাঝে পড়িয়া আছি। সে সাম্যও নাই, সে মৈত্রীও নাই, সে স্বাধীনতাও নাই; সে পুরোহিতও নাই, সে প্রতিমাও নাই, সে বালক দলও নাই। অনতি দূরে শব্দ শুনিতে পাইলাম সপ্ সপ্ সপ্; চকিতে একটি সম্মার্জ্জনী শলাকায় তাড়িত হইয়া একটি স্তূপে অধিষ্ঠিত হইলাম। সেখানেও নিস্তার নাই একটি ঝুড়িতে বাহিত হইয়া নদীতীরে নীত হইলাম। আমার সহযাত্রীরা নদী জলে নিক্ষিপ্ত হইল, যে নিক্ষেপ করিতেছিল তাহার অসাবধানতায় আমি সে পরিণাম হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম—নদীতীরেই পড়িয়া রহিলাম। এমন সময় একটি গরু আসিয়া সুদীর্ঘ রসনা বেষ্টনে আমাকে তদীয় উদরাভ্যন্তরে প্রেরণ করিল। দুই দিন পর আবার দেখি আমি এক গৃহস্থের গৃহ পার্শ্বে গোময়ের মধ্যে অর্দ্ধসুপ্ত থাকিয়া নূতন প্রভাত কিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছি। শেষ পর্য্যন্ত কয়েকটি স্থল-পথের ছিন্ন শাখাগ্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। শাখা-গুলিরও কচি কচি পাতা গজাইয়াছে।

এইরূপ নানা দুর্দ্দশার পর নূতন চেহারা লইয়া আজ আপনার কথাই মনে পড়িল। আপনি সবুজপত্রের রক্ষক; দেখিতেছেন আপনি বর্ত্তমান থাকিতেই আমার কি দুর্দ্দশা। তবে আর আমরা কাহার অহঙ্কার করিব, কাহার ভরসা করিব! আমরা ত সবুজ থাকিতেই চাই। পোড়া সংসার বাদ সাধে। সংসার বলে দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া চলিতে হয়। যদি না চলিতে চাই, সে জোর করিয়া চালাইয়া লয়। বয়সের অহঙ্কার, রঙের অহঙ্কার, তেজের

অহঙ্কার, রসের অহঙ্কার, কোন অহঙ্কারই কিছুতে রক্ষা করিতে পারি না।

আপনি যে পত্রের নিশান উড়াইয়া থাকেন, তাহা উচ্চ বৃক্ষশীর্ষ বাসী, কিন্তু তাহার অবস্থাও নিরাপদ নহে। সংসার তাহা দিয়া আরামে বাতাস খাইবার জন্য পাখা তৈয়ারী করে, অথবা তাহাতে পুঁথি লেখে, কিন্তু এ দুই অবস্থায়েই তাহার সজীব বর্ণ সে রক্ষা করিতে পারে না।

যদি ইহার একটা প্রতিকারের পথ না করিতে পারিলেন, তবে মিছাই আপনি সবুজ গৌরব করেন। আশা করি, আমি যে অবস্থাতেই থাকি, আপনি বেশ খোস মেজাজে ও বাহাল তবিয়তে আছেন। নিবেদন ইতি—

৺বিল্বপত্র বা বেলের পাতা,

হাল সাকিম—শ্রীঅরবিন্দ সেনের আঁস্তাকুড়,

ঠাকুরগাঁও।

৪ঠা চৈত্র, ১৩২৬।

শাস্ত্র ও স্বাধীনতা।

—:০:—

শাস্ত্র জিনিষটা হচ্ছে মানবজীবনের ব্যাকরণ। আর ব্যাকরণ জিনিষটা আর যাই হোক সেটা যে কোন রকমের axiom নয় এটা সেকালের গ্রীসের পিথাগোরাস্ থেকে আরম্ভ করে' একালের মাদ্রাজের রামানুজ পর্য্যন্ত সবাই সাক্ষী দেবেন। কিন্তু ওই যে বলেছি শাস্ত্র জিনিষটা ব্যাকরণ আমার বোধ হয় ঐ কারণেই টুলো-পণ্ডিতদের কাছে ওর একটার আদর যতখানি আর একটার আদরও ততখানি, অর্থাৎ—তাঁদের কাছে যেমন সংস্কৃত-কাব্যের আগে সংস্কৃত ব্যাকরণ, তেমনি মানুষের জীবনের আগে মনুর শাস্ত্র। তাঁরা যেমন সূত্র শিখে কাব্য পড়েন তেমনি শাস্ত্র শিখে জীবন গড়েন, অর্থাৎ—গড়তে চান। কিন্তু তা ত চলে না—তাই জগতের পনের আনা তিন পাই লোকের পথ ঠিক তাঁদের পথের উল্টো।

ব্যাকরণের আধিপত্য কোথায়? ব্যাকরণ না হ'লে এক পা অগ্রসর হবার উপায় নেই কোথায়? এ আধিপত্য কেবল মৃত ভাষা সম্বন্ধে—ইংরেজিতে যাকে বলে dead language, অর্থাৎ—যে-ভাষা কারোও মুখে নেই কিন্তু বইয়ের পাতায় আছে। যে-ভাষা কারো মুখে নেই অথচ একদিন ছিল, সে-ভাষা বুঝতে হ'লে ব্যাকরণ ছাড়া উপায় নেই। তেমনি শাস্ত্রের আধিপত্য কোথায়?—সেইখানে, যেখানে সমাজ মৃত। যে-সমাজ একটুকুও চলে না অথচ একদিন

চলত—সেই চলা যে কেমন চলা তা জানতে হ'লে শাস্ত্র ছাড়া উপায় নেই। যে-সমাজ আজ চলবার শক্তি হারিয়েছে তাকে চলতে হ'লে প্রতি পদে পিছন থেকে শাস্ত্রের শ্লোকের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলতে হয়। যখন নিজের চলবার উপায় নেই অথচ চলতেই হবে তখন আর কারো বা আর কিছুর ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলি তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু আপত্তি করি তখন যখন শুনি যে ঐ যে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলা ঐ-ই হচ্ছে পরম সুন্দর চলা—কেবল পরম সুন্দরই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে তা পরম মঙ্গল।

কিন্তু সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল যদি পরস্পর বিরোধী কথা না হয় তবে ঐ চলা সুন্দরও নয় মঙ্গলও নয়, কেননা ঐ ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলা মানুষের সত্য নয়, কারণ মানুষের মধ্যে যে পরম দেবতা আছেন তিনি দাসও নন, জড়ও নন।

সুতরাং ঐ ধাক্কা খেয়ে চলার বিরুদ্ধে আপত্তির কারণ হচ্ছে এই যে—মানুষ নামক জীবটির মন বলে একটি পদার্থ আছে এবং এই মন জিনিসটির দুটি অভ্যাস আছে—সে হচ্ছে চিন্তা করা ও ইচ্ছা করা।

এই জন্যেই দেখতে পাই মানুষ নিয়তই নতুন পথে চলেছে—মাড়ান সহজ রাস্তা ছেড়ে যেদিকে রাস্তা নেই, হয় ত কেবল বন কেবল কাঁটা কেবল অন্ধকার, সেই দিকে ছুটে চলেছে। তাতে অনেক প্রাণ নষ্ট হয়েছে, অনেক মন দুঃখ পেয়েছে; কিন্তু মানুষের জীবনে ঐ ত সবার চাইতে ভগবানের বড় আশীর্ব্বাদ যে মৃত্যুর ভয় তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি, দুঃখের বেদনা তাকে দুর্ব্বল করে' ফেলতে পারে নি—তা যদি পারত তবে যে তাঁর লীলা দু'দিনে মিথ্যা

হ'য়ে উঠত, অর্থহীন হয়ে উঠত, বোঝার মত হয়ে উঠত। এই যে মানুষ নিত্য নব নব পথে চলেছে তাইতেই বিশ্বমানব সম্পদশালী হয়েছে। আর এই যে মানুষ নব নব পথে চলতে পেরেছে তার কারণ তার মন নামক পদার্থটি স্বীকৃত হয়েছে এবং সেই মনের চিন্তা করা censured হয় নি।

যেখানে এই মনের চিন্তা করা ও ইচ্ছা করা censured হয়েছে এবং মানুষ সেই censure-কে একান্ত করে মেনে নিয়েছে, সেখানেই বুঝতে হবে যে মানুষের মধ্যে পরবশ্যতাটাই বড় হ'য়ে উঠেছে, সত্য হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু পরবশ্যতাই ত মানুষের চিরন্তন নয়, তার গভীরতম সত্য নয়, তাই দেখতে পাই যেখানে শাস্ত্র আপনার অধিকার ছাড়িয়ে মানুষের শৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছে, সূত্রকারের দর্ভ-আসনখানি ত্যাগ করে' প্রভুত্বের উচ্চ সিংহাসনে শস্ত্রধারী হয়ে বসেছে, সেখানে একদিন মানুষের অন্তরে অন্তরে রুদ্রের বিষাণ বেজে উঠেছে, ডমরুনিনাদ জেগে উঠেছে। মানুষ সেদিন আকুল কণ্ঠে বলেছে, আমার জানবার উপায় নেই গো, উপায় নেই। ঐ যে নিষেধের লম্বা তালিকা ঐ তালিকার তলে আমার বিচার বিবেচনাকে তলিয়ে দিতে পারব না গো পারব না। ঐ যে বিধির সংকীর্ণ লিষ্ট, ঐ লিষ্টের মাঝে আমার শক্তি গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকবে না—থাকবে না—থাকবে না। মানুষ চিরদিন বলেছে—শৃঙ্খলা আমি চাই-ই, কিন্তু শৃঙ্খল আমি চাই নে কিছুতেই।

এই যে মানুষের মনের স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা একমাত্র মানুষেরই অধিকার, এই স্বাধীনতা অস্বীকার করবে কারা?—তারাই, যারা মর্ম্মে মর্ম্মে দাস, যারা মনে প্রাণে শূদ্র, স্বাধীনতা যাদের আন-

ন্দের সামগ্রী নয়, মঙ্গলের পথ নয়, স্বাধীনতা যাদের ভয়ের বস্তু। ঐ স্বাধীনতার পথ তার যার নিজের দায়িত্ব নিজে বয়ে চলতে হয়, নিজের দেবতাকে জাগ্রত ক'রে তুলতে হয়, নিজের মন বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করতে চায়। তাই ঐ স্বাধীনতার পথ শূদ্রের অসত্যের পথ; সুতরাং অমঙ্গলের পথ ধ্বংসের পথ, তার ভয়ের বস্তু—কারণ আত্মবশ্যতা যে শূদ্রের অধর্ম্ম।

এই যে দেশের চারিদিকে আজ এই মনের স্বাধীনতা প্রাণের মুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে, সে ওই দেশের মুখবন্ধ শূদ্রান্তরাত্মার স্বাধীনতা-ভীতি থেকে উদ্ভূত করুণ আর্ত্তনাদ। কিন্তু মানুষের আত্মপ্রতারণার ত আর অন্ত নেই। তাই ঐ শূদ্র-সমষ্টির আর্ত্তনাদকে জড়িয়ে কতগুলো বড় বড় কথা আজ জেগে উঠল—কোনোখানে সনাতন ধর্ম্ম, কোনোখানে জাতীয় বৈশিষ্ট্য, কোনোখানে বাঙলার প্রাণ, কোনোখানে পেট্রিয়টিজ্‌ম্ বা অমনি আর কিছু। কিন্তু আসলে ভিতরের কথাটা হচ্ছে সবখানেই ঐ শূদ্র-অন্তরাত্মার স্বাধীনতা-ভীতি।

শূদ্র-অন্তরের এই স্বাধীনতা-ভীতিই আজ দেশের অন্তরে অন্তরে সত্য হয়ে উঠুক, দেশের বাল-বৃদ্ধ-যুবা বরণ করে নিক—এই দাস-জনোচিত প্রার্থনা আজ আমরা করতে পারব না—বলাই বাহুল্য। মানুষের সকল অমঙ্গলের মূল যে তার স্বাধীনতা, এই এত বড় একটা প্রত্যক্ষ অসত্য স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এসে বললেও আজ আমরা মানতে পারব না। আমরা আজ শূদ্র গড়তে বসি নি। তাই আজ আমরা স্বাধীনতার বাণীই মানুষকে শোনাতে চাই। যে-স্বাধীনতার মাঝে শৃঙ্খলাই মানুষের আসল সত্য, যে-স্বাধীনতার মাঝে সংযমই মানুষের আসল অমৃত। আমরা আজ চাই প্রত্যেক মানুষটি তার আপনার

ভার নিক। কারণ দেখতে পাচ্ছি আমাদের সমাজ আমাদের প্রত্যেকের ভার নিয়েছে বলে' আমরা কেউ সমাজের ভার নিতে পারি নি। কেননা সমাজ কিছুই করতে পারে না যদি না সেই সমাজের লোকেদের কিছু করবার শক্তি থাকে। সমাজ এমন একটা ভেল্কি নয় যেখানে দুটো বোকারাম মিলে একটি বুদ্ধিমান হয় বা তিনটে "বিদ্যা দিগ্‌গজ" মিশিয়ে একজন এডিসন হয়। প্রত্যেক মানুষটাকে খাটো করলে অসত্য করে' তুললে সমাজকে একদিন না একদিন তার দাম কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবেই হবে।

(২)

এই যে আজ মানুষের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দেশের চারিদিক থেকে শূদ্রান্তরাত্মার নানা তান জেগে উঠল—কোনোখানে বা দীপক কোনোখানে বা ভৈরবী কোনোখানে বা মিশ্রকানাড়া কোনোখানে বা লক্ষ্ণৌ ঠুংরী, এই সমস্ত এলোমেলো আর্ত্তনাদের ভিতর থেকে আজ যে-কথাটা আমরা-কথঞ্চিৎ স্পষ্ট করে' শুনতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাঙালীর জাতীয়তা। আমরা আজ শুনতে পাচ্ছি যে বাঙলার মাটীর নাকি এমনি একটা গুণ আছে যে এখানে জন্মগ্রহণ করলে হয় শ্রীরাধা নয় চন্দ্রাবলী নেহাৎ পক্ষে নয় ত জটিলা কুটিলার কেউ একজন হতে হবেই হবে। বাঙালীর জাতীয়তার সূক্ষ্মদেহ যে দিব্য দৃষ্টিতে দেশের একদল লোকও দেখতে পেয়েছেন এতে বাঙালীর গৌরব নিশ্চয়ই—কিন্তু এ-দেখা যে আর কেউ মানছেন না, এমন কি যাঁরা মানছেন তাঁদের পর্য্যন্ত আচারে ব্যবহারে কথায় বার্ত্তায় চিন্তায় কর্ম্মে সেই সত্যই যে প্রকাশ হ'য়ে পড়ছে না সেটা নিশ্চয়ই একটা বিষাদ ব্যথার অপেক্ষা রাখে।

আমাদের আশা আছে মহাপ্রলয়ের আগেই এ বিশদ ব্যাখ্যা একদিন না একদিন আমরা শুনতে পাব।

ইতিমধ্যে সপ্রতিভ ভাবেই এই কথাটা আজ আমরা স্বীকার করব যে একটা জাতির জাতীয়তাটা যে তার ঠিক কোন্‌খানটায়, তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেবার সাহস আমাদের নেই। কেননা চোখে আমাদের দিব্যদৃষ্টি থাকলেও কপালে আমাদের দিব্যদৃষ্টির দাবী করতে পারি নে। অপর পক্ষে আমরা জ্যামিতি শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত নই; সুতরাং আমাদের জাতীয়তাটা ঠিক রম্বস্, না রম্বোইড, না বিন্দু, অর্থাৎ—which has position but no magnitude—তা সঠিক বাৎলিয়ে দিতেও আমরা অক্ষম। কিন্তু এইটুকু বলবার সাহস আমাদের আছে যে, সমাজ যখনই কোনোখানে মাটী গেড়ে বসেছে তখনই মানুষ মিথ্যা হ'য়ে উঠেছে, কেননা মানুষের ধর্ম্ম বসে থাকবার ধর্ম্ম নয়, তা হচ্ছে সৃষ্টি করবার ধর্ম্ম, নব নব পথে নব নব জীবনের আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে।

তাই আজ আমরা বিনা দ্বিধায় এই কথাটা মনে করব যে যে-সত্যটা শাস্ত্রের কড়া শাসনে বজায় রাখতে হয় সেটা মোটেই সত্য নয়। কিন্তু আসল সত্য ঘটনা এই যে, শাস্ত্রের শাসনে কিছুই বজায় থাকে না—মনুসংহিতার পাতার সঙ্গে আজকার সমাজের দু' এক অধ্যায় মিলিয়ে দেখলেই তা ধরা পড়ে।

সুতরাং আজ আমরা জোর করেই বলব যে মানুষের মুক্তির দিকই বড় দিক, সেইটেই তার সত্যের দিক। মানুষের এই বড় দিকটায়, সত্যের দিকটায় এ পর্য্যন্ত কেউ এমন কোনো বাধা স্থাপন করতে পারে নি যাতে করে' মানুষের জীবন-স্রোত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

যখনই যেখানে এই জীবনস্রোত রুদ্ধ হবার জোগাড় হয়েছে তখনই সেখানে সমাজ-বুক থেকেই এক ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ উদ্দাম উচ্ছল গতির বেগ ভীম গর্জ্জনে প্রলয় নিঃশ্বনে সে জীবন-স্রোতের রুদ্ধ মোহনা উদ্‌ঘাটিত করে' দিয়েছে। তখন ভয়াতুরের ভীতি-কাতরকণ্ঠে করুণ আর্ত্তনাদ জেগে উঠেছে, আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে তখন তাঁরা ইষ্টদেবতার নাম জপতে বসে গেছেন; কিন্তু সেই গতির মাঝে, মুক্তির মাঝে জেগেছে নবীন প্রাণের তরুণ আনন্দ, তাদের উৎসাহ-ধারা, তাদের উৎসব-কাকলি এই তরুণ আনন্দ আবার চলেছে নব নব পথে নব নব আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে। আর এতেই বেড়েছে মানুষের গৌরব, সমাজের সম্পদ, বিশ্বমানবের নব নব কীর্ত্তি। এই হচ্ছে বিশ্বমানবের সনাতন ইতিহাস, সনাতন ধর্ম্ম।

বিশ্বমানবের এই সনাতন ইতিহাস সনাতন ধর্ম্ম অস্বীকার করে' কোনো সমাজ বা জাতিকে মন-গড়া জাতীয়তার প্লাস্‌তারা দিয়ে শক্ত করে' তুললে যে কি দুর্ঘটনা ঘটে তার সম্বন্ধে একটা গল্প আমার এক রসিক বন্ধু আমাদের শোনালেন। গল্পটা যে সত্যি তা ডাক্তার স্পুনারের মত প্রচণ্ড প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে পর্য্যন্ত মানা কঠিন। কিন্তু মিথ্যা গল্পের মধ্যেও যে অনেক সময় সত্য সিদ্ধান্ত সব থাকে তা, কি স্বদেশের বিষ্ণুশর্ম্মা, কি বিদেশের La Fontaine—দু'জনাই প্রমান করেছেন। সুতরাং গল্পটা বলছি।

(৩)

বন্ধুবর ফরাসের উপরে জোড়াসন হয়ে বসে কথকঠাকুরের মত হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগলেন—"ওই যে তোমরা শোন

গ্রীন্‌ল্যাণ্ড, গ্রীন্‌ল্যাণ্ড—যেখানে সূর্য্যদেব নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্বচিৎ কদাচিৎ উঠে নিদ্রাতুর চোখে বরফের আয়নায় মুখ দেখেন, যেখানে দু'মাইলের মধ্যে তিন জন মানুষ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, যেখানে চারিদিকে কেবল বরফ, আর বরফ, আর বরফ, চারিদিকে কেবল সাদা আর সাদা আর সাদা, সেই যে গ্রীন্‌ল্যাণ্ড তা চিরকাল এমন ছিল না। ন' লক্ষ একানব্বুই হাজার বছর পূর্ব্বে ঐ দেশটা ছিল গ্রীষ্মপ্রধান দেশ—এই ঠিক বাঙলা দেশেরই মত। তখন ও-দেশ ছিল শস্যশ্যামলা, "নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণী," "শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম, ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিণীম্"—চারিদিকে গাছ, পাতা লতা-গুল্ম ফুল ফল—কেবল সবুজ আর সবুজ আর সবুজ। তোমরা হয়ত বিশ্বাস করছ না, কিন্তু প্রমাণ শোন। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে দেশের সব পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল কিন্তু দেশের নামটার গায়ে সে-যুগের ছাপ রয়েই গেল, ঐ কারণেই ও-দেশের নাম গ্রীনল্যাণ্ড।

সে যাই হোক, সেই ন' লক্ষ একানব্বুই হাজার বছর পূর্ব্বে সেই গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে এমন এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল যে সে-সভ্যতা অর্ব্বাচীন ইউরোপীয় সভ্যতা বা অতি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার চাইতে কোন অংশে হীন নয়। তোমরা দক্ষিণ আমেরিকার চিলি সভ্যতা বা Peruvian civilisation-এর কথা শোন, উত্তর আমেরিকার গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে তেমনি এক সভ্যতা ছিল ন' লক্ষ একানব্বুই হাজার বছর আগে। গ্রীনল্যাণ্ডের সে-সভ্যতা যে কত উঁচুতে উঠেছিল সে সম্বন্ধে এইটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে তারা তিন শ' তেষট্টি রকমের মানুষ-মারা কল আবিষ্কার করেছিল।

এইখানে আর একটা মজার কথা শুনে তোমরা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হবে ও গৌরব বোধ করবে যে, সেই তখনকার গ্রীনল্যাণ্ডবাসীরা সবাই পোষাক পরত ঠিক আজকার বাঙালীর মত। মিহি তাঁতের ধূতি, আদ্দির পাঞ্জাবী, সূক্ষ্ম উড়ানি, বার্ণিশ করা লপেটা—একেবারে ফুল-বাবু। কিন্তু তারা ছিল যেমনি বলিষ্ঠ তেমনি সুন্দর—কি দেহে কি মনে। দেশে ঐশ্বর্য্য সম্পদ রাখবার আর স্থান নেই, চারিদিকে নগর নগরী জনপদ, সমুদ্রোপকূলে বিশাল বিশাল বন্দর, কত হর্ম্ম্য কত মন্দির কত স্মৃতি-সৌধ, কত প্রমোদ উদ্যান কত দীর্ঘিকা। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছিল শুধু একটা জিনিস—জীবনের আনন্দ। জীবনের আনন্দ যেন শত ধারে সহস্র ধারে লক্ষ ধারে দুর্ব্বার হ'য়ে বিচ্ছুরিত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়ছিল—কোথাও ভয় নেই, কোথাও সীমা নেই, কোথাও দ্বিধা নেই—চারি-দিকে কেবল সাহস আর সাহস আর সাহস। এই সাহসকে আশ্রয় করে' গ্রীনল্যাণ্ডে যে সভ্যতা গড়ে উঠল সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—সেই ন' লক্ষ একনব্বুই হাজার বছর পূর্ব্বে।

এমনি করে গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের সেই সভ্যতা যে কত হাজার বৎসর চলে' এল তার ঠিক নেই। এমন সময় ঘটল এক পরিবর্ত্তন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ঠিক ছ' লক্ষ সাড়ে সাইত্রিশ অব্দে হঠাৎ দেশের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন দেখা গেল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ধীরে ধীরে শৈত্য অনুভূত হ'তে লাগল। নির্ম্মল সূর্য্য ক্রমে মলিন হ'তে লাগল। গাছপালা ক্রমে কঙ্কাল বের করতে লাগল। দেশের লোকে দেখলে মিহি সূতোর ধূতি চাদর পাঞ্জাবীতে আর চলে না। রেশম পশমের আমদানী হ'ল। তাঁতিদের তাঁতে মোটা মোটা গরম কাপড় বুনোনো হ'তে

লাগল। কিন্তু পশমের মোটা কাপড় ত আর ধুতির মত করে' পরা চলে না। সুতরাং কাটা কাপড় গ্রীনল্যাণ্ডবাসীরা পরতে সুরু করলে—সেই শীত থেকে বাঁচবার জন্যে।

এই রকম ত অবস্থা এমন সময় দেশের সাতখানি সংবাদপত্র সমস্বরে চীৎকার করে' উঠল—গেল গেল গেল! কি গেল?—গেল গ্রীনল্যাণ্ডবাসীর এতদিনকার জাতীয়তা। সাতান্তর হাজার বছর ধরে তিরাশি হাজার পুরুষ যে মিহি ধুতি চাদর পাঞ্জাবী লপেটা ব্যবহার করে' এসেছে, তাই যদি গেল তবে আর গ্রীনল্যাণ্ডবাসীর জাতীয়তার রইল কি? চারিদিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। সংবাদপত্রের পাতায় কলম ছুটতে লাগল, বড় বড় সভাগৃহে বক্তাদের কড়া গলা ফুটতে লাগল! কি সে কলমের জোর! কি সে গলার তোড়! অতিরিক্ত উৎসাহী যারা তারা বলতে লাগল ঐ যে অধ্যাপক হুৎস্তক্ষিমো আবিষ্কার করলেন যে, মানুষ বাঁচতে চাইলে তার খাওয়া দরকার, সে ত তিনি ধুতি চাদর পরতেন বলে'। ঐ যে নৌ-সেনাপতি ফারুৎমিরি অসাধারণ শৌর্য্যে Iceland-এর বিরাট নৌ-বাহিনীর জন্মের মত মাথা নীচু করিয়ে দিলেন সে ত ঐ ধুতি চাদরের জোরে। পণ্ডিতেরা সব বড় বড় মোটা নিত্য-কর্ম্ম-কুঞ্চিকা সনাতন-ধর্ম্ম-পঞ্জিকা ইত্যাদি খুলে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলেন যে সেখানে পশমী কাপড়ের কোনো উল্লেখ মাত্র নেই। দেশের লোক সকল শুনে ত একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। দিকে দিকে সভাসমিতি স্থাপিত হ'তে লাগল। যেমন করে' হোক গ্রীনল্যাণ্ডবাসীর জাতীয়তা বজায় রাখতেই হবে—যেমন করে' হোক। কড়া আইন তৈরী হ'ল—শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। আইন হ'ল যে তাঁতী পশমী

কাপড় বুনবে তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আর যে তা পরবে তার প্রাণদণ্ড। রাজা শীতে হি হি করে' কাঁপতে কাঁপতে আইনে সহি দিলেন, পুলিশ হি হি করে' কাঁপতে কাঁপতে ব্যাটন উঁচিয়ে তাঁতীদের বাড়ী বাড়ী সন্ধান নিতে লাগল, আর দেশের তিন পোয়া লোক হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে মরে' গেল। এক পোয়া লোক তাদের রক্তের তেজে কোন রকমে বেঁচে রইল। শীত ক্রমে বেড়েই চলল। কি রকম প্রকৃতির নিয়ম, দেখা গেল এই এক পোয়া লোকের সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় লোম গজাচ্ছে। ক' হাজার বছর কেটে গেছে। একদিন দেখা গেল যে গ্রীনল্যাণ্ডবাসী সবাই বড় বড় রোঁয়াওয়ালা শিম্পাঞ্জি হ'য়ে উঠেছে। তারপর যখন একবার ভীষণ বরফ পড়তে সুরু করল তখন তারা সব ঠায় দাঁড়িয়ে মরল। গ্রীনল্যাণ্ডের সেই প্রাচীন সভ্যতার ও গ্রীনল্যাণ্ড বাসীর সেই প্রাচীনতর জাতীয়তার এইখানেই যবনিকা পতন।"

বন্ধুবর কথা শেষ করে' তাঁর পকেট থেকে সাজসরঞ্জাম বের করে' এমনি ভাবে একটি সিগারেট পাকাতে লেগে গেলেন যেন তিনি এতক্ষণ ধরে' যা বল্‌লেন সে-সব তাঁর নিজের চোখে দেখা ঘটনা।

বন্ধুবরের ঐ গল্পটা ডাহা মিথ্যে হোক, কিন্তু ওর পিছনে একটা সত্য আছে। সেটা হচ্ছে এই যে যখনই একটা সমাজের অচলতাকে সত্য ও বড় করে' তুলি তখন সেই সমাজের মানুষদের দ্বারা ডারউইন সাহেবের থিওরির উল্টো দিক্‌টা হাতে কলমে প্রমাণ হবার সম্ভাবনা দাঁড়িয়ে যায়।

(৪)

আমরা মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তির দিকটা, তার স্বাধীনতার দিকটা যতদূর সম্ভব প্রশস্ত করে' দিতে চাই—সমাজ-সঙ্ঘকে অসম্ভব করে' না তুলে। কেননা সঙ্ঘেই যে শক্তি, তা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু কোন্ সঙ্ঘ শক্তিমান?—সেই সঙ্ঘ যে সঙ্ঘের প্রত্যেক অংশটি সামর্থ্যবান। অর্থাৎ—সমাজের যে শক্তি তা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উচ্ছেদে নয়, তা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশে ও তাদেরই মিলনে, অর্থাৎ—প্রত্যেক ব্যষ্টির annihilation-এ নয়, সমস্ত ব্যষ্টির co-operation-এ।

এই কথাটাই আমরা ভুলে যাই যে মাতৃভূমির মূর্ত্তি গড়িয়ে পুজোই করি আর যাই করি যেমন দেশের লোকের শক্তি ছাড়া আর কোথায়ও শক্তি নেই, তেমনি সমাজের গায়ে যত তেল সিঁদুরই লেপি না কেন সেই সমাজের সভ্যদের অন্তরে ব্যতীত আর কোনোখানে দেবতা নেই। সেই দেবতাদের শক্তিই শক্তি এবং সেই শক্তির মিলনই আসল শক্তি-ভাণ্ডার। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সমাজের এই দেবতা জাগ্রত হবে না যদি না তার মুক্তির দিক থাকে। সুতরাং এই মুক্তির দিকটাকেই আজ মুক্ত করতে হবে।

এতে সমাজপতিদের ভয় করবার কিছু নেই। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দিকটা যত প্রশস্তই হোক না কেন, তারা দলবদ্ধ হবেই, সমাজ তাদের মধ্যে গড়ে' উঠবেই, কেননা দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করবার ইচ্ছা মানুষের এমনি একটা সত্য যা শাস্ত্রের শ্লোকে শ্লোকে গড়ে' ওঠে নি। সুতরাং ব্যক্তিগত মুক্তির দিক প্রশস্ততর করার মানেই

যে সমাজ-বন্ধন শিথিল হওয়া তা নয়। জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও সমাজের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই এ-সত্য ধরা পড়ে।

সকল প্রকার শাস্ত্রের মোহভার থেকে আমরা মানুষকে মুক্ত করতে চাই, কেননা একাল পর্য্যন্ত কি কর্ম্ম-জগতে কি ধর্ম্ম-জগতে মানুষের যে সম্পদ জমেছে তা মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তির দিক খোলা ছিল বলে'। হিসেব নিলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতি তাদের যা কিছু নিয়ে আজ গৌরব করছে তার অধিকাংশই লব্ধ হয়েছে দশজনের পরামর্শ সভা বসিয়ে নয়—কিন্তু এক এক জনের আনন্দের ভিতর দিয়ে, যে আনন্দ কোনো শাস্ত্রীয়-শ্লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি। এই বাঙলা দেশেই আজ আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে তিনজনকে নিয়ে সবার চাইতে বেশি গৌরব করি—মধুসূদন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ—এই তিন জনাই তাঁদের কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত মনের মুক্তির দিক দিয়ে। তা যদি না হত তাঁরা যদি পদে পদে বাঙলা গদ্য পদ্যের শাস্ত্র মেনে চলতেন তবে আজ বাঙলা সাহিত্য তাঁদের বিচিত্র সৃষ্টি দিয়ে যে সম্পদশালী হয়ে চলত না তা নিশ্চয়। বাঙলা পদ্যের পয়ারের বেড়ী যদি রবীন্দ্রনাথের মনের কঠিন শৃঙ্খল হ'য়ে থাকত তবে বাঙলা সাহিত্যে তাঁর দান আজ কি দাঁড়াত কে জানে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর মনের মুক্তির দিকটা তাঁর পক্ষে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল।

এইখানে কেউ বা বলে উঠতে পারেন যে সবাই ত আর রবীন্দ্রনাথ নয়। রবীন্দ্রনাথ তার মুক্তির ভিতর দিয়ে যে সম্পদ ব'য়ে এনেছেন অন্য কেউ এই মুক্তিকে আশ্রয় করলে হয়ত কেলেঙ্কারি করে বসবে।

কিন্তু তাতে সমাজের ভয় করবার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা ঐ কেলেঙ্কারি যে করবে সে নিজেই ঠকবে, ঠেকে শিখবে।

কিন্তু সবাই রবীন্দ্রনাথ নন। এর একটা অন্য দিকও দেখবার আছে। সমাজের সবাই যদি রবীন্দ্রনাথ হতেন তবে এতে করে' মুক্তির পতাকা সমাজের বুকে তুলে রাখবার কোনই দরকার হত না। কেননা রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিদের অন্তরে এমন একটা দীপ্ত সত্য থাকে যা সকল বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আপনাকে সার্থক করে তোলে। এঁদের কানের কাছে মুক্তি মুক্তি বলে' জপ করবার কোনই দরকার নেই, এঁরা নিজেরাই নিজের পথ করে' নেন।

আগেই বলেছি, সবাই রবীন্দ্রনাথ নয়। প্রত্যেক সমাজে তিন রকমের লোক আছেন। এক রবীন্দ্রনাথের মত যাঁরা অসাধারণ, যাঁদের সাক্ষাৎ ক্বচিৎ কদাচিৎ মেলে। আর এক রকম অতি সাধারণ, যাঁরা হাজার বক্তৃতা হাজার উৎসাহ হাজার উদ্দীপনার মাঝেও বাঁধা পথে পাকা হয়েই থাকবেন। শালগ্রামের মত এঁদের শোয়া বসা সমান। তমের টানই এঁদের মধ্যে প্রবল। আর এই অসাধারণ ও অতিসাধারণের মাঝে আর এক রকমের লোকআছেন যাঁরা এমনি একটা আলগা সাম্য অবস্থায় এমনি একটা equllibrium অবস্থায় আছেন যে এঁদের একটু ঠেলে দিলে উপরে উঠতে পারেন আবার একটু টিপে দিলে নীচে নেমে পড়বেন। এঁরা একটা কিছু হলেও হতে পারেন, একটা কিছু করলেও করতে পারেন—যদি থাকে তাঁদের পিছনে সমস্ত সমাজের অনুমতি সমস্ত সমাজের উৎসাহ ও উদ্যম। এঁদের জন্যেই চাই সকল অতীতের শাসন-ভীতি থেকে, শাস্ত্রীয় শৃঙ্খল থেকে সমাজের মাঝে মুক্তির বাতাস, কেননা

অসাধারণরা যদি সমাজের মাথা হন তবে এঁরাই হচ্ছেন তার মেরুদণ্ড। মাথা যে সস্তারই ব'য়ে আনুক মেরুদণ্ডের যদি তা গ্রহণ করবার ও বহন করবার শক্তি ও প্রবৃত্তি না থাকে তবে সে অসাধারণের দানের মূল্য সমাজের কাছে হ'য়ে থাকবে কেবল শূন্য।

তাই আজ আমাদের স্পষ্ট করে' বলতেই হবে যে—চাই মুক্তি। মুক্তি—সকল প্রকার বন্ধন থেকে, অর্থাৎ—সকল প্রকার মিথ্যা থেকে। কেননা মিথ্যাই বন্ধন। চাই মুক্তি সেই শাস্ত্র থেকে যে শাস্ত্রে আমাদের মনের ছাপ নেই, প্রাণের ছাপ নেই, বুদ্ধির ছাপ নেই, আমাদের কালের ছাপ নেই। আমরা আমাদের একালের জীবনকে মুক্ত করতে চাই সেকালের শাস্ত্র থেকে। কেননা জীবন হচ্ছে কাব্য আর শাস্ত্র হচ্ছে ব্যাকরণ। কিন্তু আজ আমাদের মুখের বাঙলা ভাষার গায়ে সংস্কৃতের স্পর্শ থাকলেও যেমন তা সংস্কৃত নয়, তেমনি আমরা সে কালের লোকের বংশধর হলেও আমাদের মন ঠিক তাঁদের মন নয়। সুতরাং আমাদের মন তাঁদের শাস্ত্র দিয়ে একেবারে প্রতি পদে চালিত হতে পারে না। আমরা যেন আজ মনে করতে পারি যে আমরা গরুও নই গাধাও নই—আমরা মানুষ। এই নতুন কালের মাঝে নতুন অবস্থা নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নতুন প্রশ্ন নতুন সমস্যার সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়িয়ে জীবনকে মঙ্গলের পথে জয়ের পথে গৌরবের পথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের স্বাধীনতার মধ্যেই আছে, অতীতের শাস্ত্রের মধ্যে নেই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ফাঁকা।

—:*:—

বাড়ীর উঠানে একটা মস্ত জামগাছ ছিল। জাম সে বছর বছর দিত না—তবু তার বয়স পঞ্চাশ বছর। জন্মে অবধি তাকে দেখছি। শুনেছি সে বাবার নিজের হাতে পোঁতা। আমার বেশ মনে আছে, পেরেক ফুট্‌বে বলে বাবা তার গায়ে বাড়ীর নম্বর-আলা টিনের চাক্তি মারতে দেন নি।

কতজনে তার কত নিন্দা করতে লাগলো। কেউ এসে বললে "জামগাছের হাওয়া ভাল নয়", কেউ বললে "ঐ জন্যেই তোমাদের বাড়ীর অসুখ ছাড়ায় না", কেউ বললে "তা না হোক্ বাড়ীটাকে আওতা করে রেখেছে", কেউ বললে "রাত্রে মাথা-ঠুকে যাওয়া সম্ভব", কেউ বললে "জামের ডাল বড় পল্‌কা—ছেলেপিলে না পড়ে যায়", কেউ বললে "কাটলে অনেক তক্তা বেরোবে—বাড়ী মেরামত করছো, কাজে লাগবে।"

দশের কথায় কান ভারী হল—তবলদার ডেকে আনালুম। তারা এসেই কোপ জুড়ে দিলে। আমি আড়ালে বসে কাজ করতে লাগলুম কিন্তু কোপের আওয়াজ কেমন ভাল লাগলো না—উঠে তফাতে চলে গেলুম; কিন্তু কেন জানি না তখনি আবার উঠানে এসে দাঁড়াতে হল।

দেখি, গাছকে তখন নেড়া করে ফেলেছে। কোথায় গেছে তার

সেই সবুজ ছাতি যা সে এতদিন ধরে মাথায় দিয়ে ছিল। আমি বাড়ীর ভিতর গেলুম একটা পান খেয়ে আসতে।

এসে দেখি, তার গোড়ার বাঁধন ঢিল হয়ে এসেছে। কোপের মুখে সে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে; তবু প্রাণপণে মাটী কামড়ে আছে—তার অনেক দিনকার মাটী। চাকরকে "তামাক সাজ" বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

ফিরে এসে দেখি যে টলমল করে দুলচে—দুজনে দড়ি দিয়ে তাকে টানচে, আর একজন তখনো গোড়ায় কোপ মারচে। তবু সে পড়তে চায় না। তার দু'চারটা শির-বেরোনো আঙুল তখনো মাটীকে মুঠো করে ধরে রয়েছে, আর গোড়া দিয়ে হুহু করে লালচে রস বেরোচ্ছে—সে রস, না রক্ত।

আছে—এখনো আছে। এখনো যদি তার গোড়ায় মাটী চাপা দেওয়া যায়, হয়ত সে সামলে ওঠে। কিন্তু কেউ তা দিলে না। সে চিড় চিড় করে শব্দ করে উঠলো—আমি খুব জোরে গড়গড়ার নল টানলুম।

'মিড়—মিড়—মিড়—মড়—মড়—মড়—মড়—ধড়াম্'। সব শেষ। নীচের দিকে চেয়ে দেখি সে পড়ে রয়েছে, উপর দিকে চেয়ে দেখি খোলা আকাশ হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে।

সকলে এসে বললে—"বাঃ বাড়ীময় আলো—কেমন ফাঁকা দেখাচ্চে।"

আমি উত্তর দিলুম—"সবই ফাঁকা।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

প্রজাস্বত্বের কথা।

—:০:—

বীরবলজী,

আর একটু হলেই আপনাকে 'বীরবল বাবু' বলে ফেলেছিলাম। হঠাৎ স্মরণ হল আপনি আকবর শাহের দরবারের "দরবারী" ছিলেন। এ দেশে তখনো "বাবু" কথাটা চলতি হয় নি। অতএব আপনাকে "জী" বলেই সম্ভাষণ করতে সাহস করছি, "মিষ্টার" বললেও হয় ত হত, কিন্তু দেশী লোকের নামের সঙ্গে ঐ শব্দটার প্রয়োগ আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারি নে। আগে মনে করতাম বিলেত-ফেরত ব্যক্তিদের নামের আগেই ও-টার ব্যবহার হয়। যাঁরা কখনো বিলেত যান নি, এখন দেখছি তাদের নামকেও ঐ শব্দটি অলঙ্কৃত করেছে। যা হোক, "জী" সম্বোধনে ভরসা করি, আপনার কোনো আপত্তি হবে না, কারণ ওটা সনাতন সম্বোধন।

আপনাকে এই পত্রখানা লেখবার আবশ্যক হচ্ছে এই যে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এবারকার (গত বৎসরের ফাল্গুন-চৈত্র মাসের) সবুজপত্রে "রায়তের কথা" লিখেছেন, আর আমি হচ্ছি একজন রায়ত ও কৃষক, সুতরাং আমার ও-সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। আর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ও, যাঁকে চৌধুরী মহাশয় "রায়তের কথা" লিখেছেন, আমার বক্তব্যটা ইচ্ছা করলে শুনতে পারবেন। তাঁকে শোনাবার কারণ এই যে, কৃষ্ণনগরের রায়ত সভায় এবং মেদিনীপুরের

প্রাদেশিক সমিতিতে কৃষকের হিতের জন্য তিনি দুটো ভাল কথা বলেছেন। মানুষের স্বভাবই এই যে, যেখানে মানুষ দুটো মিষ্ট কথা শুনতে পায়, সেইখানেই আর দুটো কথা বলতে চায়। তাই আমি আপনার কাছে, তথা রায় মহাশয়ের কাছে, দুটো কথা বলতে সাহস করেছি। আপনি ঠিকই বলেছেন যে অবস্থা বুঝলে ব্যবস্থা করবার সুবিধা হবে। এ পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় যাঁরা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কৃষকের অবস্থাটা বেশ ভাল করে বোঝেন এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তার উপর ব্যবসাদার সম্প্রদায়ের, মিউনিসিপালিটির, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের, যেমন নির্ব্বাচিত নিজস্ব প্রতিনিধি আছেন, কৃষক সম্প্রদায়ের তেমন নির্ব্বাচিত নিজস্ব প্রতিনিধি নেই। কিন্তু জমিদারদের সে রকম প্রতিনিধি আছেন। তা' ছাড়াও অন্য রকমে নির্ব্বাচিত হয়ে, জমিদার স্বয়ং এবং প্রতিনিধি দ্বারা ব্যবস্থাপক সভায় তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেন। এখন শুনছি সে অবস্থাটা থাকবে না। এর নিয়মগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নি। এখন চাই কৃষকের যিনি প্রতিনিধিত্ব করতে চাইবেন তাঁকে কৃষকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আর প্রতিনিধির কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করলে, পরে আর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হতে পারবেন না। এই প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন সম্বন্ধেই ব্যবস্থাপক সভায় একবার কি হয়েছিল, তা' বোধহয় আপনি জানেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের পাঁচ শালা বন্দোবস্ত, তারপর শাল শাল বন্দোবস্ত, তারপর দশ শালা বন্দোবস্ত, তারপর দশ শালের দু'শাল না যেতে যেতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ; তারপর ১৮৫৯ শালের দশ আইন, তার পর ১৮৬৯ শালের আট আইন প্রভৃতি সব করেও যখন কৃষকের দুঃখ

ঘুচল না, তার প্রতি অত্যাচার কমল না, তখন ১৮৭৬ সালে এই আইন-সাগর মন্থন করে একটা নতুন আইন করবার জন্য এক পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হল। উদ্দেশ্য, কৃষকের স্বত্বটা সুনির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। স্মরণ রাখবেন প্রজাস্বত্ববিষয়ক এতগুলি আইন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রজাস্বত্ব পদার্থটিই অনির্দ্দিষ্ট থেকে গিয়েছে! যাক্ তিন বৎসরব্যাপী বাদানুবাদের পর এর ফল হল এক কমিশনের নিয়োগ। একটা Rent Law commission নিযুক্ত হল, আর তার সাহায্যের জন্য নিযুক্ত হ'ল এক কমিটি, যার সদস্য হলেন অভিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারী, নীলকর সাহেব ও জমিদার!! আর প্রজা বা তার প্রতিনিধি?—নাদারৎ। কৃষকের পিতৃ-পুরুষের পুণ্যফলে এঁদের প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপিটি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন নি। এবারেও শোনা যাচ্ছে যে, বিহারের নীলকর ও জমিদার জোট বেঁধেছেন। প্রজার হিতে না কি এঁদের অহিত হয়। আর এঁরাই জগৎকে বোঝাতে চান যে এঁরাই প্রজার স্বাভাবিক নেতা! এই জন্যই এবার কৃষকের অকৃত্রিম নেতা চাই।

আপনার কথায় বোধ হয় যে পাছে জমিদারেরা মনে করেন যে, আপনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী সেই জন্য আপনি শঙ্কিত। কিন্তু আপনি জানেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা যে প্রকৃতই চিরস্থায়ী হবে এমন কেউ-ই মনে করেন নি। কারণ, বন্দোবস্তটা করবার আগে কোনো অনুসন্ধানই করা হয় নি। আপনি ত আকবরের দরবারের অন্যতম রত্ন। আকবর টোডরমলের সাহায্যে কেমন করে দেশটাকে পরগণায় পরগণায় ভাগ করে জমির গুণাগুণ অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করে, আর নিরিখ বেঁধে দিয়ে কানুন-গো

পাটোয়ারি নিযুক্ত করে সমস্ত ব্যাপারটা শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপর মুরশিদকুলী খাঁও বাঙলা দেশে ঐ রকম করে খাজানা নির্দ্ধারিত করে দিয়েছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস এসব বিষয়ের কোনো অনুসন্ধানই করলেন না। স্থানীয় রীতি কি, তারও অনুসন্ধান করলেন না। এই অনুসন্ধানটা না কি কোম্পানীর ডিরেক্টারেরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কোম্পানীর রিপোর্টে উল্লিখিত আছে—"the lights formerly derivable from the Kanungo's office were no longer to be depended on, and a minute scrutiny into the value of lands by measurements and comparison of the village accounts, if sufficient for the purpose, *was prohibited from home* (Fifth Report on the affairs of the East India Company to the House of Commons vol. I, page 23). অনুসন্ধান ত হলই না, তাঁর পরিষদবর্গের মতামতও নেওয়া হল না। শোর প্রভৃতি মন্ত্রিরা যখন ত্রুটি দেখিয়ে দিলেন তখন লর্ড কর্ণওয়ালিস যেন একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন—"I think it unnecessary to enter into any discussion of the grounds on which their (Zamindars') right appears to be founded. It is the most effectual mode for promoting the general improvement that I look upon as the important object for our present consideration, (Lord Cornwallis, in the Fifth Report vol. I, page 591). গবর্ণর জেনারেল যখন এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক অনাবশ্যক মনে করলেন তখন আর তর্কবিতর্ক অবশ্যই হল না।

১৭৯৩ সালের ২২ মার্চের সুপ্রভাতে লর্ড কর্ণওয়ালিস ঘোষণা করলেন —"The Governor General in council accordingly declares to the Zamindars, independent Taluqdars and other actual proprietors of land, with or on behalf of whom a settlement has been completed that at the expiration of the term of the settlement (ten years) no alteration will be made in the assessment which they have respectively engaged to pay, but that they and their heirs and lawful successors will be allowed to hold their estates at such assessments *for ever*. Land systems in British India, by Baden-Powell. vol. I, p. 400, foot note,). এখন দেখুন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলভিত্তি যে ঘোষণা, তাতে কৃষকের নামমাত্র নাই, আছে জমিদার তালুকদার এবং অন্যান্য জমির অধিকারী! কৃষকের অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় নি। তার স্বত্ব ত পরের কথা। এ সম্বন্ধে একজন অজ্ঞাতনামা সিভিলিয়ান তার "Land Tenures" নামক গ্রন্থে বলেন, "In point of law and fact, the raiyats can claim (that is ordinary raiyats can claim) under the provisions of Lord Cornwallis' Code, NO RIHTS at all. (Land Tenures, by a Civilian. page 104).

কিন্তু যাক স্বত্ব অধিকারের কথা। চৌধুরী মহাশয় বলেছেন ও কথাগুলো আমরা বুঝি না। কিন্তু আমরা যা বুঝি, হাড়ে হাড়ে বুঝি, তারই একটা প্রতিকার হোক। এই সে দিন পর পর দু'বৎসর

অনাবৃষ্টি হওয়ায়, দেশে হাহাকার পড়ে গেল, লোকের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই। কৃষক ভিক্ষা করে' কর্জ্জ করে' চুরি করে' প্রাণ পাখীটিকে কোনো রকমে দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে রাখলে। জমিদার ও মহাজন তাঁদের প্রাপ্যের জন্য নালিশ করলেন, জমি বিক্রী হয়ে গেল, আর যা-কিছু ছিল, তাও তাই হল। কৃষক দিন-মজুরী করতে আরম্ভ করলে। এটা যে কৃষক বুঝেছে, সে বিষয়ে বোধ করি কারো কোনো সন্দেহ নেই। অনাবৃষ্টিটা ভারতবর্ষের একচেটে সম্পত্তি কি না জানি নে, কিন্তু অনাবৃষ্টির ফল দুর্ভিক্ষ যে ভারতবর্ষের একচেটে তা বেশ জানি। সেটা আর অন্য কোনো দেশে হয় না। কিন্তু কৃষকের জমিটুকু যদি বাস্তবিকই কৃষকের হত, বাকী খাজনার জন্য যদি নিলাম বিক্রী হয়ে না যেত ত কৃষককে কুলী হতে হত না। কথা উঠতে পারে তা হলে জমিদারের বাকী খাজনা কি করে আদায় হবে? এর উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। নানা উপায়ে তা হতে পারে। তার মধ্যে একটা উপায় হচ্ছে এই যে, শস্য উৎপন্ন হলে কৃষকের খরচের মত রেখে, বাকীটা ক্রোক করে, বিক্রী করে নেওয়া যেতে পারে। জমিদারকেও সতর্ক হতে হবে, তিনি ঘুমিয়ে থাকবেন আর যখন ইচ্ছা নালিশ করে কৃষকের জমিটুকু কেড়ে নেবেন, তা হতে পারবে না। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান আইনটিও বড় চমৎকার। কৃষির লাঙ্গল, গোরু, বীজ প্রভৃতি বিক্রী হতে পারে না, কিন্তু যাতে লাঙ্গল, গোরু, বীজের ব্যবহার হবে, সে জমিটা বিক্রী হতে পারে! এই ক্রোক বিক্রীটা এ দেশে সম্পূর্ণ নতুন। হিন্দুদের রাজত্বেই বলুন, আর মুসলমানদের রাজত্বেই বলুন এটা ছিল না। এটি সম্পূর্ণ বিলিতি আমদানী। কোম্পানীর বিলিতি কর্ম্মচারীরা এ দেশের জমিদারকে তাঁদের দেশের

land lord বলে যেমন ভ্রম করলেন, প্রজাকেও তেমনি tenant বলে ভ্রম করলেন। আর সেই ভ্রমের বশেই সেখানকার ক্রোকের আইনটা এ দেশে আমদানী করে ১৭৯৩ শালের ২২ রেগুলেশন দ্বারা এ দেশে জারি করলেন। Rent Law Commissioner-দের রিপোর্টে প্রকাশ যে—"distraint is an off set of English Law, which was originaly introduced into this country by Regulation xxii of 1793, which empowered certain specified landlords to distrain and sell the crops and products of the earth of every description the grain, cattle, and all other personal property) whether found in the house or on the premises of the defaulter or any other person) belonging to the tenants. This continued to be the law until 1859 when the power of distraint was limited to the produce of the land on account of which the rent was due. এর থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে জমিদারের সুবিধার জন্য যা-কিছু আবশ্যক সবই করা হয়েছিল, প্রজার জন্য কিছুই করা হয় নি। এর পূর্ব্বের রেগুলেশন, অর্থাৎ—১৭৯৩ সালের ৭ রেগুলেশনটি আরও ভয়ানক—তার দ্বারা আদালতের সাহায্য না নিয়েই জমিদার প্রজার সম্পত্তি ক্রোক করতে পারতেন এবং প্রজাকেও গ্রেফ্‌তার করতে পারতেন। প্রায় বিশ বৎসর প্রজা এই উৎকট আইনের যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। তারপর ১৮১২ সালের ৫ রেগুলেশনের দ্বারা গ্রেফ্‌তারের ক্ষমতা উঠিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু সম্পত্তি ক্রোকের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ থাকল। রেন্ট-ল-কমিশনারগণ

ক্রোকের ক্ষমতাটাও সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রবল জমিদারেরা প্রবল আপত্তি করলেন। আর প্রজার পক্ষে কথা কইবার একটি লোকও ছিল না। সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হল না। কমিশনের রিপোর্টে আছে—"The Rent Law Commission proposed to abolish the law of distraint altogether but to this strong objections were taken (Rent Law Commissioner's Report. Vol 1. p. 6).

চৌধুরী মহাশয় বলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা emergency আইন। কিন্তু সে সময়ে কোন emergency ত দেখতে পাওয়া যায় না। ১৭৬৫ শালে কোম্পানী বাঙ্‌লা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানী পান। সেই সময় থেকেই কিসে সহজে বিনা আয়াসে এই বিস্তীর্ণ দেশটার খাজানাটা কোম্পানীর ধনাগারে এসে পৌঁছয়, এই ছিল কোম্পানীর চিন্তার বিষয়। আটাশটি সুদীর্ঘ বৎসর এই চিন্তায় কেটে গেল। তারপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জারি হল। আর যিনি জারি করলেন তিনি বললেন যে এ নিয়ে আর তর্কবিতর্ক তিনি চান না, অনুসন্ধানও চান না। Energency আইন হোক আর নাই হোক, আইনটি আর এ অবস্থায় থাকতে পারে না, এর আমূল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন দরকার, তাতে লোকে Bolshevism ই বলুক আর যাই বলুক। সময় মত এই পরিবর্ত্তন ও সংশোধন হয় নি বলেই ত আজ রাশিয়ার দুর্ব্বল প্রজা বলসেবী হয়ে উঠেছে। যে সময়ে এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হল সেই সময়ে ফ্রান্সের দুর্ব্বল প্রজারাও বলসেবী হয়েছিল, তখন অবশ্য বলসেবী কথাটা জন্মায় নি। কিন্তু Bolshevic কথার উৎপত্তি হোক আর নাই হোক, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার

নামে অনেক অত্যাচার অনাচারই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তা হলেও ফরাসীবিপ্লবকে আজ আর কেউ অবিমিশ্র অমঙ্গলের হেতু মনে করে না। কিন্তু এদেশে কৃষকদের মধ্যে তার কোনো সম্ভাবনাই নাই। সে অর্দ্ধাশন ও রোগকে জীবনের চিরসহচর করে নিয়ে সমস্ত শরীর মনের বল হারিয়ে দারিদ্র্য-দুঃখকে অদৃষ্ট-দেবতাপিত করে বসে আছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এবং তাঁর মত কৃষক-হিতৈষী যদি এই শাসন-প্রণালীর পুনর্গঠনের দিনে তার পক্ষ হয়ে দাঁড়ান, তা'হলে কৃষক কৃত-কৃতার্থ হবে। আরম্ভেই বলেছি, আমি কৃষক, আমার অভাব অভিযোগ দুঃখ ক্লেশ অনেক। আপনার যদি শোনবার সহিষ্ণুতা থাকে ত আরো ক্রমে বলব।

চাতরা, হাজারিবাগ,
১০ই বৈশাখ, ১৩২৭।

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

আর্য্য অনার্য্য।

—:০:—

১৩২৫ সনের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যার সবুজপত্রে "বাঙলা ভাষার কুলজী" ব'লে আমার এক প্রবন্ধ বা'র হয়। এই বছরের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের "প্রতিভা"তে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তার এক সমালোচনা ক'রে আমায় সম্মানিত ক'রেছেন। দেশে আর এখানে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় এতদিন চন্দ মহাশয়ের সমালোচনাটির উপর আমার বক্তব্য লিখে উঠ্‌তে পারি নি, তবে "Better late than never"—এ প্রবাদের নজীরে অল্প কিছু লিখে পাঠাচ্ছি। আমার প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সঙ্গে চন্দ মহাশয়ের মতের মিল নেই। তিনি মনে ক'রেছেন, তাঁর প্রতি আমি 'ঠেস দিয়ে কথা ব'লেছি,' তাঁকে উদ্দেশ ক'রে আমি শ্লেষ-বিদ্রূপ ক'রেছি, তাই তিনি একটু অসহিষ্ণু হ'য়েছেন মনে হয়। কিন্তু আমি কৈফিয়ৎ হিসেবে বল্‌ছি, প্রবন্ধ লেখবার সময় তাঁর কথা আমার আদৌ মনে হয় নি—তাঁর সমালোচনা পড়ে তিনি এইরূপ ভাব প্রকাশ ক'রেছেন

দেখে আমি বিশেষ অশ্চর্য্যান্বিত হ'য়েছি। জাতিতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি আমি নিতে পারি নে, কিন্তু "গৌড়রাজমালা" ও "Indo-Aryan Races"-এর লেখককে আমি যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখি। আমার প্রবন্ধ আমি কোনও ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ ক'রে লিখি নি; চন্দ মহাশয় আমার মন্তব্যগুলিতে ক্ষুণ্ণ হওয়ায় আমি দুঃখিত।

কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারটা কিছুই নয়। বাঙালী জাতির আর আর বাঙলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন মত পোষণ করি। আমি আমার প্রবন্ধে ব'লেছি, বাঙালী জাতি হচ্ছে মূলত মিশ্র অন্-আর্য্য জাতি, আর্য্যভাষা আর আর্য্য সভ্যতা নিয়েছে মাত্র; তাও খুব প্রাচীন কালে নয়। বাঙলাভাষার রীতিনীতি হচ্ছে আর্য্যেতর; উপাদান, অর্থাৎ—ধাতু শব্দ প্রভৃতি আর্য্যভাষার, কাঠাম বা রূপ হচ্ছে অনার্য্য। বাঙলা ভাষার ঠিক ইতিহাসটি বা'র হ'লে যে-জাতের মধ্যে এ ভাষার উদ্ভব সে-ই বাঙালী জাতের সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হবে। বাঙলার অনার্য্য ভাষীর মুখে মাগধী অপভ্রংশ ব'দলে বাঙলা ভাষায় পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে। বাঙলা ভাষার চর্চ্চায় প্রাকৃত সংস্কৃত পড়া দরকার, কিন্তু কোল-দ্রাবিড়-বোডোর চর্চ্চাও বাঙালীর ভাষার আর জাতীয় উৎপত্তির আলোচনার পক্ষে খুব বিশেষ ভাবে উপযোগী, এই হচ্ছে আমার মূল বক্তব্য। চন্দ মহাশয় এই মতের ঘোরতর বিরোধী। তাঁর মত হচ্ছে এই যে, ভারতের আর্য্যভাষীরা দু'দলের লোক ছিল, একদলের মধ্যে বৈদিক ভাষা আর সভ্যতার বিকাশ, এরা হ'চ্ছে "ভিতরী" দল, মধ্যদেশের অধিবাসী; আর একদল অবৈদিক আর্য্য-

ভাষী, এরা "বাইরী"-দল, মধ্যদেশের অধিবাসীদের চারদিকে উপনিবিষ্ট হয়। গুজরাত হ'য়ে মধ্যভারতের জঙ্গল দিয়ে 'দলে দলে' বাঙলায় আসে;—জাতি, অর্থাৎ—race হিসেবে বৈদিক আর্য্য থেকে দ্বিতীয় দল আলাদা। বাঙালীর উৎপত্তি এই অবৈদিক আর্য্য থেকে, বাঙলা ভাষার মূলে এই অবৈদিক আর্য্য-ভাষা;—অবৈদিক আর্য্যদের মধ্যে শাক্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি; এরা বর্ণাশ্রমের ধার ধারত না, পরে মধ্যদেশ থেকে ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক ধর্ম্ম এসে এই অবৈদিক বাঙালী প্রভৃতি বাইরী-দলের আর্য্যদের বংশধরদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করে। বাঙলার অনার্য্য প্রভাবকে তিনি যেন আমল দিতে চান না।

চন্দ মহাশয় যে "ভিতরী-বাইরী" দুই প্রশাখার আর্য্য জাতি ও ভাষায় আস্থাবান, সেই দুই শাখার কল্পনা প্রথম করেন পরলোকগত পণ্ডিত হর্‌ন্‌লে। ভারতের অধুনিক আর্য্য-ভাষাবিদ্‌গণের অগ্রণী স্যর জ্যরজ্ গ্রিয়ার্সনও এই দুই শাখার আর্য্যের তথা আর্য্যভাষার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তিনি মনে করেন, ভাষা হিসেবে হিন্দী আর মধ্যদেশের অন্য উপভাষাগুলি একদিকে, আর অন্যদিকে পঞ্জাবী সিন্ধী গুজরাতী বিহারী বাঙলা মারাঠী; অর্থাৎ—বাইরী-দলের ভাষাগুলির মধ্যে কতকগুলি ধ্বনি আর নাম ও ধাতুরূপ ঘটিত বিশেষত্ব সমভাবে বর্ত্তমান, যেগুলি লুপ্ত অবৈদিক আর্য্য থেকে পাওয়া, আর যেগুলি ভিতরী-দলের সংস্কৃতজ ভাষা হিন্দীতে মেলে না; আর বাইরের ভাষাগুলির প্রকৃতি আর আচরণ, মধ্যদেশের হিন্দীর থেকে, মৌলিক পার্থক্য থাকার দরুণ, একেবারে পৃথক। এই মত অনুসারে ভারতের আর্য্যভাষার বংশতালিকা এই রকম দাঁড়ায়:—

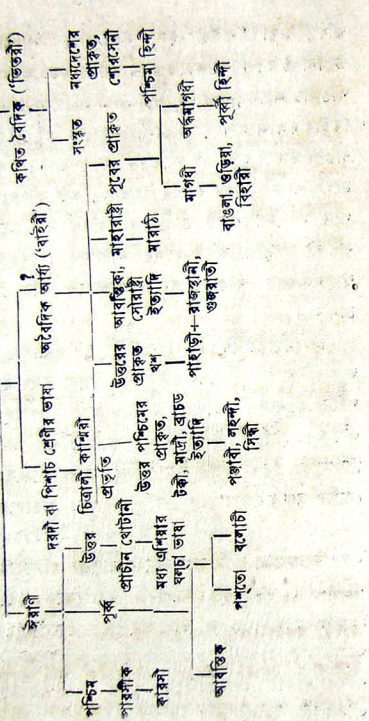

এই বংশলতিকায় দেখা যাচ্ছে যে, বাঙলা সিন্ধী মারাঠী, এরা হচ্ছে এক পুরুষ অন্তরিত—হিন্দী এদের থেকে আলাদা। সংস্কৃত ভাষা হচ্ছে হিন্দীর মাতৃস্বসৃ-সম্পর্কের, বাঙলার সঙ্গে সে সম্পর্কটা অত ঘনিষ্ঠ নয়। এ ছাড়া, দরদী-ভাষার প্রভাব নোতুন ক'রে লহন্দী সিন্ধী রাজস্থানী গুজরাতীর উপর প'ড়েছে, অনুমান করা হয়। আবার কাশ্মিরী মূলে হচ্ছে 'বাইরী' শ্রেণীর দরদ-ভাষা, কিন্তু সংস্কৃতের আর প্রাকৃতগুলির প্রভাবে কাশ্মিরী অন্যরূপ ধ'রে ব'সেছে। মধ্যযুগে বৈদিক আর অবৈদিক বা 'ভিতর-বাইরী' বিভাগের প্রাকৃতগুলির মধ্যে পরস্পর খুব প্রভাব পড়ে; বিশেষত শৌরসেনী আশ-পাশের বাইরী-প্রাকৃতের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে তাদের রূপ একেবারেই ব'দলে দেয়। আর তা ছাড়া, 'ভিতরী'-আর্য্যদের মধ্যে উৎপন্ন সংস্কৃতভাষার প্রভাব, "ভিতরী-বাইরী" দু'দলের চেহারা অনেকটা ব'দলে দিয়েছে—বাইরী-দলের ভাষাকে যেন ভিতরীর সামিল ক'রে ফে'লেছে।

বিলেতে এসে গ্রিয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে এই 'ভিতরী-বাইরী' বিষয়ে আলাপ হয়, কিছু পত্রব্যবহারও চলে। তিনি বলেন যে এই 'ভিতরী-বাইরী' মতটা একটা থিওরি বা অনুমান মাত্র; জোর ক'রে কিছু বলা চলে না। কখন, কিভাবে এই দু'দলে ভারতে আর্য্যভাষার প্রসার ক'রেছিল, আর পরস্পর সংঘাতে বা সম্মিলনে এসেছিল, সে সম্বন্ধে

কিছুই বলা যায় না। আর বাঙালী, কাশ্মিরী বা গুজরাতী একজাতির কিনা, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু ব'লতে পারেন না; তবে তাঁর মনে হয়, এরা এক জাতের নয়, যদিও খুব সম্ভব একই মূল থেকে এদের ভাষার পত্তন।

এই 'ভিতরী-বাইরী' থিওরি ভারতের আর্য্যভাষার ইতিহাসে একটা নোতুন সমস্যা এনে দিয়েছে। সকলেই জানে যে বেদের ভাষা হ'চ্ছে সাহিত্যের ভাষা—সাধু ভাষা; প্রাচীনকালে অনেক লৌকিক 'ভাখা' ছিল, যাদের থেকে প্রাকৃত ও আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি। এই সব লৌকিক ভাখায় এমন ধরণ কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল নিশ্চয়ই, যেগুলি আর্ষ আর শিষ্ট ভাষা, বৈদিক আর সংস্কৃতে ঠাঁই পায় নি। এখন লৌকিক বা প্রাকৃত বা কথ্য বৈদিক ভাখাগুলি কতটা একই গোষ্ঠীতে প'ড়ত, আর কতটাই বা একেবারে ভিন্ন গোষ্ঠীতে প'ড়তে পা'রত, তা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। অর্থাৎ—'ভিতরী-বাইরী' মতের অনুকূল বংশকল্পনা না হ'য়ে, এই রকমটা যে ছিল না, তা কেউ জোর ক'রে ব'লতে পারে না। পাঞ্জাব, মধ্যদেশ, প্রাচ্য—এইরূপে আর্য্য-ভাষার প্রসার; কাজেই যখন হয় ত মধ্যদেশে প্রাকৃতের কাছাকাছি ভাষা চ'লছে, তখন প্রাচ্যে আর্য্যভাষা আসেই নি, বা এসেছে মাত্র। সুতরাং সব জায়গায় প্রাকৃতের উৎপত্তি এক সময়ে হয় নি অনুমান করা যায়।

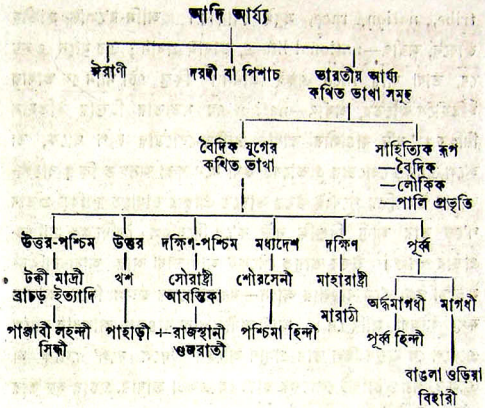

শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয়ের জাতি তত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণার আলোচনা করবার শক্তি আমার নেই, কারণ আমি ও-বিদ্যার ব্যবসায়ী নই। যদিও তাঁর বাঙালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুমান, আর হিন্দু শাক্ত বৈষ্ণব মতের ইতিহাস নির্ণয়ের চেষ্টা আমার, আর আরও অনেকের কাছে বিশেষ কাল্পনিক ব'লেই মনে হয়। তিনি আমাকে দুটো মস্ত অপ-সিদ্ধান্ত প্রচার করার জন্য দায়ী ক'রেছেন। একটা এই যে আমি মনে করি ভাষার দ্বারা জাতের পরিচয় পাওয়া যায়। কথাটা আমি যে ভাবে ব'লেছি তা যিনি আমার প্রবন্ধ প'ড়েছেন তিনিই সহজে ধ'রতে পেরেছেন। মুস্কিল হ'য়েছে, এক 'জাতি' শব্দে বাঙলায় caste,

tribe, nation, race, সবই বোঝায়। আমি ব'লেছি, জাতীয় জীবনে, অর্থাৎ—national life-এ, ভাষাই প্রধান; এর মানে এ নয় যে, ভাষা আর race একই জিনিস। কিন্তু এটা মানি যে ভাষার ইতিহাসে জাতের, অর্থাৎ—nation-এর সভ্যতার চিন্তার ইতিহাস নিহিত। যদি বাঙালীর ভাষার দ্রাবিড়-বোডোর ছাপ থাকে, তা হ'লে দ্রাবিড়-বোডোর প্রভাবের কথা মনে করা অসঙ্গত কি? বাঙলা-ভাষার উৎপত্তির পূর্ব্বেই উত্তর ভারতে প্রাকৃত ভাষাতে দ্রাবিড় প্রভাব প'ড়ে তার আর্য্য বিশুদ্ধি নষ্ট ক'রে দিয়েছিল; বৈদিকেও দ্রাবিড়-প্রভাব স্পষ্ট। উত্তর ভারত থেকেই আর্য্যভাষা আর আর্য্য-দ্রাবিড়-সভ্যতা গঙ্গা ব'য়ে বাঙলায় আসে—মধ্যভারতের জঙ্গল দিয়ে আসার কথা আমরা জানি নে। আর্য্যভাষী লোক বাঙলায় আসবার আগে এদেশে যে মানুষ ছিল তার প্রমাণ আছে। 'দলে দলে' লোক না এলেও, অল্প দু'চারিটি লোকের দ্বারা যে একটা ভাষার প্রচার হয় তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমাদের চোখের সামনে মধ্যভারতে, নেপালে এ ব্যাপার ঘটছে। মুষ্টিমেয় রোমান ঔপনিবেশিকদের ল্যাটিন ভাষা স্পেন, ফ্রান্স ডেশিয়ার প্রাচীন ভাষাগুলিকে লুপ্ত ক'রে দিয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিম আয়র্লাণ্ডে ইংরাজির প্রসার, পরাক্রান্ত জাতির ভাষা ব'লে, সভ্যজাতির ভাষা ব'লে, আইরিশদের মধ্যে সংহতিশক্তির অভাব ছিল ব'লে হয়েছে—'দলে দলে' ইংরেজ গিয়ে কখন ও-দেশ ছেয়ে ফেলে নি। কাগজের এককোণে আগুন ধরার মত এদেশে আর্য্যভাষার প্রচার; 'জাত' আর্য্য বিজেতার আগমনে পাঞ্জাবে আর্য্যভাষার স্থাপন, তারপর মধ্যদেশে প্রচার; সুদূর অতীতের অন্ধকারে বৈদিক যুগ বা তার পূর্ব্ব থেকেই উত্তর ভারতে আর্য্য দ্রাবিড়ের সংঘাত ও সম্মিলন। যেখানে

আর্য্যভাষা আর গাঙ্গ আর্য্যদ্রাবিড় সভ্যতার সামনে একটা সাত্ত্বাভিমান কিছু খাড়া হ'য়েছে, সেখানেই আর্য্যভাষার অপ্রতিহত গতি খর্ব্ব হ'য়েছে; সুসভ্য কন্নাড়ী, দ্রাবিড় আর অন্ধ্র জাতির ভাষার মূলোৎপাটন ক'রতে আর্য্য ভাষা সক্ষম হয় নি। যদিও অপেক্ষাকৃত সভ্য আর্য্য-দ্রাবিড় উত্তর ভারতের শিক্ষার ভাষা ও সভ্যতার বাহন ব'লে সংস্কৃতের প্রভাব প্রাচীন কাল থেকেই কন্নাড়ী, তেলুগু তামিলে পড়ে। অনার্য্যভাষী জাত যে বাঙলাময় ছিল, তা বাঙলা দেশের স্থানীয় নামে বেশ বোঝা যায়। আজকালকার বাঙলায় অনেক নাম আর্য্যরূপ নিয়েছে, অনেক নামের চেহারা ব'দলে গেছে; কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মাঝেও যদি কেউ বাঙলার পরগণার, গাঁয়ের আর নদী প্রভৃতির নামের তালিকা ক'রত, তা হ'লে "আড্ডহাগস্তি," 'নাড্ডিনা,' 'মোলাড়ন্দী,' 'বাল্লহিট্টা,' 'সোববড়ি,' খগ্‌গালি চম্যলা-জোলী,' জৌগল্ল,' 'থৈসাডোড্ডিচাক্কোজান,' 'দিজমক্কাজোলী,' 'লচ্ছুবড়া,' 'কোণ্টোহাড়া,' 'উনৈপোলা,' 'অঝড়াচৌবোল' 'নামুণ্ডিকা,' 'নেক্কা-ডেববরী,' 'পিণ্ডারবিটি-জোটি(লি)কা,' প্রভৃতি নাম, যার কতকগুলি মাত্র বাঙলার পুরাতন তাম্রশাসন থেকে তুলে দিলুম। শত শত পাওয়া যেত। এরূপ নামগুলি যে কোনও আর্য্যভাষার, আর্য্যভাষী জাতের মধ্যে উদ্ভূত, তা প্রমাণ করা কঠিন মনে হয়। আর্য্যভাষী বাঙালীকে আমি অনার্য্য ব'লছি; ভাষা আর জাতি race এক—এই অপসিদ্ধান্ত কি যুক্তিতে চন্দ মহাশয় আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন, বুঝতে পারছি নে।

দ্বিতীয় অপসিদ্ধান্ত যা আমি প্রচার ক'রেছি ব'লে চন্দ মহাশয় গম্ভীরভাবে সংশোধন করবার চেষ্টা ক'রেছেন, সেটা হচ্ছে এই যে,

আমি ব'লেছি 'বৈদিক থেকে প্রাকৃত, আর প্রাকৃত থেকে বাঙলা'। এখন আমার বলা উচিত ছিল যে 'বৈদিক যুগের কথিত ভাষা'—তা সেই কথিত ভাষা ভিতরীই হোক্ আর বাইরীই হোক্। আজকালকার চল্‌তি কথিত আর্য্যভাষা যে ধারাবাহিক ভাবে প্রাচীনকালের কথিত ভাষা থেকে উৎপন্ন, এ তথ্য নোতুন ক'রে প্রতি-পদে বুঝিয়ে দেবার আবশ্যকতা রাখে না। ভাষা বহতা স্রোত; আর্য্যভাষার নদী থেকে খাল কেটে সংস্কৃত আর তার পূর্ব্বের আর পরের সাহিত্যের ভাষা। আর্য্য ভাষার বহতা স্রোত অনার্য্যভাষার মরা গাঙের খাত দিয়ে চ'ল্‌ছে। ভারতের আর্য্যভাষার ইতিহাস আলোচনার সুবিধার জন্য তিনটি স্তরে ভাগ করা হয় ঃ—'প্রাচীন আর্য্য' Old Indo-Aryan; 'মধ্য আর্য্য' Middle Indo-Aryan; 'নবীন আর্য্য' New or Modern Indo-Aryan. সাধারণত এই তিনটি স্তর যথাক্রমে 'বৈদিক' বা 'সংস্কৃত,' 'প্রাকৃত,' আর 'ভাষা'—এই তিন সংক্ষিপ্ত ও বিশিষ্ট নামে উল্লিখিত হ'য়ে থাকে, সুতরাং আমি বৈদিক থেকে প্রাকৃত বলায় যে ভয়ানক অপসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছি তা মনে হয় না। যদিও ঋগ্‌বেদের ভাষা বা পাণিনীর সংস্কৃত থেকে আধুনিক ভাষা বা প্রাচীন প্রাকৃতের উদ্ভব ব'ললে ঠিক অবস্থাটি বলা হয় না। আর আমি সে কথা কোথায়ও বলি নি।

আমার "বাঙলা ভাষার কুলজী" প্রবন্ধে আমি মিটানীর ঈরাণী কুচারীর কথা, ভিতরী-বাইরী থিওরির কথা আনি নি; আর আমি ও-থিওরিতে বিশ্বাস করবার মত কোনও প্রমাণ এখনও পেয়েছি বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত ব'লে রাখি, ডক্টর সটেন্ কনোউ প্রমুখ দুই চারিজন, যাঁরা এ বিষয়ে গবেষণাকারিদের মধ্যে অন্যতম, দরদী

প্রশাখার পৃথকত্বে বিশ্বাস করেনা; ডক্টর কনোউ মনে করেন পিশাচ বা দরদীশ্রেণী ঈরাণীর প্রশাখা মাত্র। বাঙলা (গুজরাতী, সিন্ধী, লহন্দার কথা আনতে চাই নে—কারণ ওই পশ্চিমা ভাষাগুলির ইতিহাস একটু অন্য ধরণের) ভাষাকে আমরা সরাসরি মাগধী-প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে 'বৈদিক' বা কথিত Old Indo-Aryan-এ নিয়ে যেতে পারি। মাঝে থেকে কোনও বাইরী শ্রেণীর প্রাকৃতকে কল্পনা ক'রে আনবার কারণ দেখি নে। হয়ত যে ভাষা থেকে বাঙলার উৎপত্তি, তার দু'চারিটা বিশেষত্ব পশ্চিমের আর্য্য ভাষাগুলির মূল যে ভাষা তাতেও মেলে। কিন্তু বাঙলার উৎপত্তি, শৌরসেনীসম্ভূত পশ্চিমা হিন্দীর সঙ্গে এক গোষ্ঠিতে বলেই মনে হয়। সম্প্রতি লণ্ডনের "বুলেটিন অভ্ দি স্কুল অভ্ ওরিএণ্টাল ষ্টাডীজে" স্যর জ্যরজ্ গ্রিয়ার্সন ভিতরী বাইরী দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব প্রমাণ ক'রবার জন্য কতকগুলি ভাষাগত বস্তু বা fact এনেছেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তার অন্য, এবং সহজ ব্যাখ্যা হয়। স্যর জ্যরজ্‌কে এ বিষয়ে চিঠি লেখায় তার উত্তরে তিনি ব'লেছেন যে বাঙলা কাশ্মিরী প্রভৃতির যে মিল, সেটা অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ঘটলেও, এই মিল হ'চ্ছে, তাঁর মতে, আদি বাইরী ভাষার থেকে কুলগত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতার (inherited tendency-র) ফল। তাঁর ব্যাখ্যা মোটেই সন্দেহ-নিরাসক নয়। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের কচকচি এনে সবুজপত্রের পাঠকদের উপর এখন উৎপীড়ন করতে চাই নে।

বাঙলাভাষা যে আর্য্যশ্রেণীর ভাষা, একথা সকলেই জানে; ভারতের আর্য্যভাষীরা যে দু'দলের দুই জাতের লোক ছিল, সে অনুমান এখনও সুদৃঢ় হয় নি—অন্তত পূর্ব্ব ভারতের পক্ষে সে

অনুমানের পক্ষে দৃঢ় প্রমাণ কিছুই নেই—অথর্ব্ব বেদের "ব্রাত্য", আর ব্রাহ্মণের "ব্রাত্য স্তোম", আর "দীক্ষিত বাক্", আর "হে অলব হে অলব" প্রভৃতি বচন নিয়ে খালি speculation বা জল্পনা চ'লছে মাত্র। হ'তে পারে 'ভিতরী-বাইরী' মতই ঠিক—অবৈদিক আর্য্য-ভাষীর ভাষা থেকে বাঙলার উৎপত্তি—সংস্কৃতের সঙ্গে, হিন্দীর সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক এক-পুরুষে' সম্পর্ক নয়—দু-তিন-পুরুষে'; হ'তে পারে প্রাচীন ভারতে বেদবহির্ভূত আর্য্যেরা দলে বেশই ভারী ছিল, আর বেদ-স্রষ্টা আর্য্যের আগেই তারা পূর্ব্বভারতে এসেছিল। কিন্তু বাঙলার পক্ষে ব্যাপারটা দাঁড়ায় "আর্য্য-বনাম-অনার্য্য"—তা আর্য্যদের ভিতরী-বাইরী দু'ঘরে ফেলাই হোক বা 'বৈদিক' বা Old Indo-Aryan ব'লে এক কোঠায় ফেলাই হোক।

যুক্তিতর্কের উপর বিচার ক'রে যা সম্ভবপর ব'লে মনে হয় সেই মত সকলের নেওয়া উচিত। 'আর্য্যামি' বা 'দ্রাবিড়ামি' বা অন্য কোনও গোঁড়ামির বশীভূত হ'য়ে বিশেষ এক মত খাড়া করবার চেষ্টা টিঁকবে না। আমাদের দেশের একটি বিশিষ্ট মত যা শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত অধিকাংশ লোককে অভিভূত ক'রে আছে সেটার নাম দেওয়া হ'য়েছে "আর্য্যামি"; এই জিনিসটি অতি হালের, গত শতাব্দীর ভাষাতত্ত্ব আর প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় এর উদ্ভব, রাজার জাতের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব কল্পনার পুলকে, পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে সাকুল্যলাভের আশায় এর প্রসার। আমাদের দেশের লোকের মনে আর্য্যামির যে কল্পনা বিদ্যমান, যথার্থ ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার দ্বারা প্রেরিত হওয়ায় চন্দ মহাশয় তার উর্দ্ধে উঠেছেন; তাঁর Indo-Aryan Races বই তার প্রমাণ। তাঁর বেদ-বহির্ভূত বাইরী-আর্য্যকে বাঙালীর পূর্ব্ব-

পুরুষ হিসেবে খাড়া ক'রলে দেশের প্রচলিত 'সনাতন' আর্য্যামি খুশী হবে না, এটা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। চন্দ মহাশয় সত্যের অনুসন্ধিৎসু; তিনি যা লক্ষ্য ক'রে চ'লেছেন, তা আরও অনেকের লক্ষ্য-স্থল। প্রাচীন ইতিহাসের সবই অন্ধতমসাচ্ছন্ন। নৃ-তত্ত্ব, নৃজাতি-তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, কেউ আলাদা আলাদা চ'লতে পারে না; অন্যথা প্রাচীনের স্বরূপ জানবার চেষ্টা অন্ধের হাতী দেখার মত ব্যাপার হ'য়ে প'ড়বে। আমাদের হিন্দু সভ্যতাটা যে একটা মিশ্র ব্যাপার, তা সর্ব্ববাদিসম্মত। নামের মোহে প'ড়ে হিন্দু সভ্যতা গ'ড়তে অনার্য্যের সাহায্যকে অস্বীকার বা উপেক্ষা ক'রলে চ'লবে না। ৺রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা এই প্রকার বিচারের সারবত্তা যথার্থ উপলব্ধি ক'রেছেন। ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ আর্য্যভাষী লোকের আগমন থেকে, সত্যি; কিন্তু তার ইমারতের বুনিয়াদ হ'চ্ছে প্রাগ্-আর্য্য যুগে, ভারতের নিজস্ব দ্রাবিড়ের সভ্যতায় আদিকালের আর্য্য কখন কোন্ সময়ে নিজের ভাষা আর বিশিষ্ট সভ্যতা গ'ড়ে তোলে তা জানা যায় না। এই ভাষা, সভ্যতার স্রষ্টা ব'লে Proto-nordic, অর্থাৎ—আদি-উদীচ্য নাম দিয়ে একটা জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে বিশ্বাস করেন। আদি আর্য্যসভ্যতা যা এদের মধ্যে বিকশিত হ'য়েছিল, তা সমসাময়িক মিসর, বাবিলান, এজিয়ান সভ্যতার কাছে দাঁড়াতেই পারে না; অনার্য্য জাতির সংস্পর্শে আর সাহচর্য্যে অর্দ্ধবর্ব্বর, খুব সম্ভব মিশ্র আর্য্য,—গ্রীক, পারসীক, হিন্দু সভ্যতা গঠনে নিজের ভাষা দান ক'রে ধর্ম্মের কবিতার সূত্র কতকগুলি দিয়ে অংশ গ্রহণ করে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, হিন্দুধর্ম্ম, চিন্তা ও সভ্যতার ইতিহাস, ভারতের আর্য্য ও দ্রাবিড় ভাষার

মুখ্যত এই আর্য্য অনার্য্যের সম্মিলনের ইতিহাস। সব বিষয়েই 'অতি'র দিক আছে; চন্দ মহাশয়ের মতে 'দলে দলে' আর্য্যভাষীর প্রসারের সঙ্গে আর্য্যভাষার প্রচার; ওদিকে দক্ষিণী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পি, টি শ্রীনিবাসিয়েঙ্গার তাঁর "Life in Ancient India in the Age of the Mantras" নামক অতি উপাদেয় বইয়ে ব'লেছেন—The Aryan invasion of India is a theory invented by scholars to account for the existence of an Indo-Germanic language in North India In tracing the history of India after this theoretical event, scholars treat of India as if the previous inhabitants were so few and so devoid of stamina or of culture as to be practically effaced by the invaders or steadily driven to the east." তাঁর মনে হয় যে ভারতে আর্য্যভাষা আর্য্যসভ্যতা বাইরে থেকে এসেছিল peaceful overflow of language and culture হিসেবে।

উত্তর ভারতে আর্য্যভাষা প্রচলিত হ'য়েছে অতি প্রাচীন কাল থেকে, এটা একটা বাস্তব কথা; আর ভারতের চলতি আর্য্যভাষার সঙ্গে দেশের অনার্য্যভাষার, বিশেষ দ্রাবিড়, যতটা মিল—ধাতু বা শব্দগত নয়, অন্তর্নিহিত চিন্তা প্রণালীগত,—ততটা মিল বাইরের অন্য দেশের আর্য্যভাষার সঙ্গে নয়, এও একটা প্রমাণ-করা বাস্তব কথা। অনার্য্যের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগ, আর তার গভীর প্রভাব ছাড়া এই সাদৃশ্যের কারণান্তর দেখা যায় না। আর্য্যভাষা বাঙলা দেশে আসবার আগে এদেশে দ্রাবিড়, কোল, মোন-খ্মের জাতের বাস ছিল, ভোট-ব্রহ্ম জাতের শাখা বোডো জাতি উত্তর পূর্ব্বে ছিল। কোন্ সময়ে আর্য্যভাষা বাঙলা দেশে আসে তা নির্ণয় করা কঠিন। মগহী মৈথিলের সঙ্গে বাঙলা ওড়িয়ার মিল এত বেশি যে এই চার ভাষা একই মাগধী অপভ্রংশ থেকে উৎপন্ন ব'লে মনে করা হয়। এই মাগধী অপভ্রংশ বড় প্রাচীন যুগের ভাষা নয়, বুদ্ধদেবের আগে বাঙলায় আর্য্যভাষী জাতি ছিল কিনা প্রমাণ নেই। সিংহলজয়ী বিজয় সিংহকে বাঙলার অধিবাসী মনে ক'রে আমরা গৌরব করি, কিন্তু পালি বইয়ের "লাট" রাজ্য যে "রাঢ়" নয়, পশ্চিম ভারতের "লাট", সে পক্ষে যুক্তি আরও বেশি। মহারাজা অশোকের আগে এদেশে আর্য্যভাষী বড় একটা যে ছিল তার পক্ষে প্রমাণ নেই। অশোকের অনুশাসন পাওয়া গেছে উড়িষ্যায় পুরীজেলায় আর গঞ্জামে; তা থেকে প্রমাণ হয় না যে উড়িষ্যায় আর্য্যভাষা চ'লত; কারণ অনার্য্য-ভাষীর দেশে অশোকের অনুশাসন পাওয়া গেছে, আর উড়িষ্যা অশোকের বহু শতাব্দী পরে আর্য্যভাষা ও সভ্যতা পায়। হিউএন্‌ত্‌সাঙ্‌-এর সময়েও হয় ত সমস্ত বাঙলাদেশ আর্য্যভাষী হয় নি। বাঙলার অনার্য্যকে ভাষায় (আর সভ্যতায়) আর্য্যীকরণের প্রক্রিয়া এখনও চ'লছে, তবে খৃষ্টান মিশনারির আগমনে সে প্রক্রিয়া অনেকটা রুদ্ধ হ'য়ে আসছে; পশ্চিম বাঙলার আদি অনার্য্য রাঢ় চুহাড় জাতি, আর ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে নবাগত বহু সাওতাল, ভূমিজ—উত্তর বাঙলার নানা ভোট ব্রহ্মজাতি, এখন ত পুরো বাঙলাভাষী হিন্দু হ'য়ে গেছে, বোডোভাষীরা অনেকেই ক্রমে বাঙালী বা আসামী ব'নে যাচ্ছে। এসব বিষয়ের দিকে না তাকালে বা এসব কথা ভুলে গেলে ত চ'লবে না; কারণ এ যে আমাদের জাতীয়

ইতিহাসের অংশ। চন্দ মহাশয় এসব কথা বিলক্ষণই জানেন; তিনিই ত উত্তর বঙ্গের কাম্বোজ বা ভোট-ব্রহ্ম রাজাদের রাজত্বের লুপ্ত ইতিহাসের কথার পুনরুদ্ধার ক'রেছেন। বাঙালীর মধ্যে অনার্য্য-উপাদানের কথায় তাঁর এতটা রাগের কারণ কি বুঝতে পারি নে। তিনি মাথা মাপামাপি নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু দীর্ঘকপাল, কি মধ্যকপাল, কি হ্রস্বকপালের বিচার কি অভ্রান্ত? নৃ-তত্ত্বের আলোক কি একেবারে স্থির আলোক? একাধিক ভিন্ন type থেকে কি একটা নোতুন type বিশিষ্টতা পেয়ে দাঁড়ায় না? নৃ-তত্ত্বের মত নৃজাতি-তত্ত্বের রীতি নীতি সভ্য সমাজের চর্চ্চাও কি জাতীয় ইতিহাসের পক্ষে উপযোগী নয়? খালি বেদ-ব্রাহ্মণ-সূত্র-পুরাণ-পিটক-তন্ত্র চর্চ্চা ক'রলে ত চ'লবে না; তার সঙ্গে জনসাধারণের বিশ্বাস আর আচার, জঙ্গলী সাওতাল ধাঙড় গারোর ধর্ম্মের আচারেরও চর্চ্চা দরকার। এক কথায়, ভারত খালি আর্য্যের নয়; আর্য্যের দত্ত ভাষার গৌরবে পারিপার্শ্বিকের জ্ঞান হারা'লে, কি ভাষাতত্ত্ব, কি ইতিহাস, সমস্তরই আলোচনা অসম্পূর্ণ হবে—সত্যনির্দ্ধারণের প্রধান এক পথ রুদ্ধ হ'য়ে যাবে।

'ভিতরী-বাইরী' সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করবার বাসনা রইল।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

লণ্ডন,
২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯২০।

পাগল।

—*—

পাগল চলিল পথে!
সূর্য্য যখন বিদায় লভিল অস্তাচলের রথে।
অন্ধকারের ঘনঘোর কায়া
ছাইল নিখিল ভুবনের মায়া,
শ্রাবণ ধারার বন্যা ছুটিল অন্ধ আকাশ হ'তে,
পাগল চলিল পথে।

গুরু দেয়া গরজনে,
স্তব্ধ মেদিনী শিহরি উঠিল সহসা আপন মনে।
চপলা হাসিল চঞ্চল হাসি,
অসীমের পথে পবন উদাসী,
সৃষ্টিছাড়া সে পাগল মাতিল ধ্বংসের আগমনে
গুরু দেয়া গরজনে।

বিজন মাঠের মাঝে,
সর্ব্বনাশের পথে সে ধাইল সর্ব্বহারার সাজে!
জটাজাল উড়ে পবনের আগে
অগ্নির শিখা নয়নেতে জাগে
বিকট হাস্যে কাঁপাইল ধরা সেদিন প্রলয় সাঁঝে
বিজন মাঠের মাঝে।

অদূরে শ্মশান ঘাট,
ভূতভৈরব নর্ত্তন রত গৃধিনী শিবার হাট।
ক্ষুধাতুর চিতা অনল উগারি
নিবিড় শূন্য ফেলিছে বিদারি,
চারিদিকে ঘন, ধ্যান পরায়ণ তরুপ্রান্তর মাঠ,
অদূরে শ্মশান ঘাট।

আসিল আপনা হ'তে,
প্রকৃতি তখন উজলি উঠেছে সুধাকর-সুধা-স্রোতে,
শ্মশান মেলায় নির্জ্জন কোণে
দাঁড়াইল আসি পুলকিত মনে
একটি বিন্দু ঝরিল কেবল অশ্রুধারার পথে,
আসিল আপনা হ'তে।

দাহনকারীর দল
উন্মাদলীলা চাহিয়া দেখিল—বিস্মিত, অচপল।
সম্ভ্রমে ক্ষ্যাপা নোয়াইল শির,
স্পর্শিল ধূলি মৃত্যু ভূমির,
নির্ব্বাক সবে দাঁড়ায়ে রহিল—শান্ত অচঞ্চল
দাহনকারীর দল।

উঠিল সে সোজাসুজি,
বক্ষ তাহার ভাসিয়া গিয়াছে অশ্রুপ্লাবনে বুঝি!
গর্জ্জন-গানে ভরিল বিমান
ত্রস্ত, ব্যস্ত বিশ্ব-পরাণ
"রুদ্রের মাঝে মঙ্গল যিনি—তাঁহারেই আমি পূজি"?
উঠিল সে সোজাসুজি।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়।

পত্র।

শ্রীযুক্ত 'সবুজপত্র' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

চাতরা (হাজারিবাগ) হ'তে শ্রীহৃষীকেশ সেন নামধেয় জনৈক ভদ্রলোক আমাকে যে পত্র লিখেছেন, সেখানি আপনার নিকট পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি "রায়তের কথা" লিখে যে হুজুগের সৃষ্টি করেছেন, পত্রলেখক তারই জের টেনে এনেছেন। আশা করি এ পত্র সবুজপত্রে স্থানলাভ ক'রবে। পত্র-লেখক মহাশয় দুটি জিনিস করতে জানেন, এক পড়্‌তে আর এক লিখতে। বইয়ের সঙ্গে যে তাঁর পরিচয় আছে তার প্রমাণ তাঁর লেখার পত্রে পত্রে পাবেন, আর তিনি যে লিখতে জানেন তার প্রমাণ ছত্রে ছত্রে পাবেন। এ বাজারে ও-দুটি গুণের একাধারে সাক্ষাৎ লাভ নিত্য ঘটে না। নিত্য যা দেখা যায় সে হচ্ছে এই যে যিনি লেখেন তিনি পড়েন না, আর যিনি পড়েন তিনি লেখেন না। পত্রলেখক নিজেকে কৃষক বলে পরিচয় দিয়েছেন। এ হেন কৃষক-সংখ্যা বাঙলায় যদি বেশি থাকত তাহলে, আপনার স্থাপিত রায়তের মামলার একতরফা ডিক্রী হয়ে যেত,—কেননা ও-অবস্থায় জমিদার প্রতিবাদী কোনো জবাব দাখিল করতে সাহসী হতেন না।

এখন নিজের কথায় আসা যাক্। ও-পত্র কেন যে আমাকে পাঠান হয়েছে তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। কোনো কোনো সমালোচক আমার লেখার ভিতর শিক্ষানবীশের হাত দেখতে পান, কিন্তু কোনো কোনো পাঠক তার ভিতর যে জমানবীশেরও হাত দেখতে পান, এ সন্দেহ ইতিপূর্ব্বে আমার মনে কখনো উদয় হয় নি। লেখকের বিশ্বাস আকবর বাদশার কার্য্যকলাপ আমার কাছে অবিদিত নয়, অতএব তাঁর কৃত বাঙলার জমিজমার বন্দোবস্তের খবর আমি নিশ্চয়ই রাখি। আকবর সাহেবের আমলের বিষয়ে যে আমি ওয়াকিবহাল এ কথা অস্বীকার করা আমার মুখে শোভা পায় না। যদি সে আমলের ইতিহাস শুনতে বাঙালীপাঠকের কৌতূহল থাকে ত আমি সে কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারি। যে রাজসভার সেক্রেটারি ছিলেন আবুল্ ফজল্, সভাকবি ছিলেন ফৈজী, বিদূষক ছিলেন, বীরবল, গায়ক ছিলেন তানসেন, চিত্রকর ছিলেন, আবদাস সামেদ, আকবর শাহের সে দরবারকে মোগল-বিক্রমাদিত্যের সভা বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এ সভার বাক্যচিত্র আঁকতে যার হাতে কলম আছে তার লোভ হওয়াও অত্যন্ত স্বাভাবিক। পাঠকসমাজ ফরমায়েস করলেই সে ছবি আমি আঁকতে বসে যাব। ইতিমধ্যে আমার বক্তব্য এই যে, সে যুগের জমিজমার বন্দোবস্তের সঙ্গে বীরবলের কোনোরূপ সংশ্রব ছিল না। বীরবল ছিলেন, আলোর উপাসক। আলো দেখলেই তিনি প্রণাম করতেন, তা সে আলো সূর্য্যেরই হোক্ আর প্রদীপেই হোক্। মাটি নিয়ে যে তিনি কখনো মাথা বকিয়েছেন, তার প্রমাণ নাদারৎ। ক্ষিতি আর তেজ এ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধাতু, এর একটির মায়ায় যিনি আবদ্ধ অপরটির দিকে তিনি দৃকপাতই

করেন না। আকবর শাহের দরবারীদের মধ্যে মাটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন টোডরমল, বীরবল নয়। বীরবল জানতেন আর যে কোনো বস্তু নিয়েই হোক্ না কেন, মাটি নিয়ে রসিকতা করা চলে না। জন্মভূমি মানুষের শুধু জননী নয়, আমরণ ক্ষীরধাত্রীও বটে। বীরবল যে কথাটা বুঝতেন সে কথা বাঙলার পলিটিসিয়ানরা বুঝলে আজকের দিনে জমিজমা নিয়ে দেশের লোকের সঙ্গে তাঁরা ইয়ারকি করতে উদ্যত হতেন না।

সে যাই হোক, পত্রলেখক মহাশয় তাঁর পত্রখানা যখন আমার বরাবর পাঠিয়েছেন তখন এ বিষয়ে দু'চার কথা বলতে আমি বাধ্য। এখন শুনুন আমার মত।

পত্রলেখক মহাশয় টোডরমলের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এ কালের ভাষায় এবং এক কথায় বলতে হলে, সে বন্দোবস্ত ছিল "রায়ত-ওয়ারি", অর্থাৎ—উপরে রাজা ও নীচে রায়ত এই দুজনেই ছিল জমির সত্ব এবং উপসত্বের অধিকারী, মধ্যে কোনো নতুন মধ্যসত্তওয়ালাকে ঢুকতে দেওয়া দূরে থাক, যারা আগে ঢুকে গিয়েছিল তাদেরও বহিস্কৃত করে দেওয়া হয়েছিল। একমাত্র বীরবলের খাতিরে আকবর বাদশাহ এ নিয়ম ভঙ্গ করেন। বীরবল জায়গির পেয়েছিলেন তিন পরগণার, তার মধ্যে তিনি যেটি আমলে এনেছিলেন তার নাম কালঞ্জর। আকবরের পূর্ব্বের আমলে দিল্লীর বাদশাহরা আমির-ওমরা চাকর-নফরকে মাইনে না দিয়ে জায়গির দিতেন, এবং সেই জায়গিরদারেরা ছিল একালের জমিদারদের প্রথম সংস্করণ। আকবর শাহ্ পাঠান বাদশাহ্দের কৃত এ বন্দোবস্ত উল্টে ফেলে সনাতন হিন্দু প্রথাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠ করলেন, যেমন তিনি আরো অনেক বিষয়ে করেছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মোটামুটি তিন যুগে বিভক্ত করা যায়, প্রথম হিন্দুযুগ, দ্বিতীয় মুসলমানযুগ, তৃতীয় ইংরেজযুগ। জমির সত্ত্ব সম্বন্ধে এ তিন যুগের তিন ধারণা।

হিন্দুযুগে জমি ছিল তার, যে তা চষে, অর্থাৎ—প্রজার। সে যুগে "ক্ষেত্রকর্ষক" এবং "ক্ষেত্রস্বামী" ছিল একই ব্যক্তি। এ সত্ত্বের মূলে ছিল লাঙ্গল।

মুসলমানযুগের সার কথা এই যে, জোর যার মুলুক তার। যে বাহুবলে দেশ জয় করে সেই তার মালিক, অর্থাৎ—রাজা। এ সত্ত্বের মূলে ছিল তলওয়ার।

ইংরাজযুগে জমির মালিক হচ্ছে সে, যে তার রাজস্ব আদায় করে, হয় দাখিলা দিয়ে, নয় নালিশ করে, অর্থাৎ—রাজাও নয় প্রজাও নয়—টেক্স কলেক্টর। এ সত্ত্বের মূলে লাঙ্গলও নেই তলওয়ারও নেই, আছে শুধু কাগজ।

জমির সত্ত্ব-স্বামীত্ব সম্বন্ধে এই তিনটি মূলসূত্র ধরিয়ে দিয়ে আমি খালাস। তারপর আপনারা যত পারেন এর টীকাভাষ্য করুন। আপনাদের এই সব তর্ক বিতর্কের ফলে শেষটা এর একটা উত্তর মীমাংসা দাঁড়িয়ে যাবেই। দেখতে পাচ্ছি আপনি চেষ্টা করেছেন এই তিন সূত্রের একটি সমন্বয় করা, ফলে কোনো পক্ষেই ষোলআনা আপনার স্বপক্ষ হবে না।

প্রজাপক্ষ বলবে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যখন অনাদি নয়, তখন অনন্ত হতে পারে না।

জমিদার পক্ষ বলবেন, যার বিষয়ে কেতাবে লেখা আছে চিরস্থায়ী, বস্তুগত্যা তা অচিরস্থায়ী হতে পারে না।

মডারেট দল জমিদারের কথায় সায় দেবেন।

ন্যাসানালিষ্ট দল বলবেন, এখন ও-সব কথা তুলে কাজ নেই। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে প্রজার আত্মাকে উদ্বোধিত করা, তার জীবন-মরণের ভাবনা পরে ভাবা যাবে। দেশের লোকের যাতে পিঠে আর কিছু না সয় তার জন্য যা কিছু বলা-কওয়া দরকার সেই সব করা যাক, তাদের পেটে খাবার কথাটা লক্ষ্মী ভাই আমার, এ সময় আর তুলো না। আগে আমরা দেশউদ্ধার করি, পরে তোমরা পতিত উদ্ধার করো।

এ সব কথার উত্তরে আপনি অবশ্য সকল পক্ষকে পর পর এই সব কথা বলতে পারেন, যথা—

প্রজাপক্ষকে—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনন্ত না হলেও কল্যান্ত হবে না। অনেক বস্তু চিরস্থায়ী না হলেও সুচিরস্থায়ী হতে পারে।

জমিদারকে—ইংরেজদের আইনের কেতাব আমাদের কোরাণ নয়; সুতরাং আমাদের হাতে পড়লে সে কেতাব আমরা আবার নতুন করে লিখতে পারি, অতএব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অক্ষরে আছে বলে যে তা অক্ষয় হবে, তার কোনই সম্ভাবনা নেই।

মডারেটদের—কোনো বিষয়ে সায় দেওয়া আর রায় দেওয়া এক জিনিস নয়। আর আমরা যা চাই সে হচ্ছে মায় ফয়শালা রায়।

ন্যাসানালিষ্টদের—জনসাধারণের জীবনের অবস্থা যেমন আছে তেমনি রেখে তাদের মনের অবস্থা একদম বদলে দেওয়া অসম্ভব। তারা জীবনে থাকবে "দাস" আর মনে হবে "স্বরাট্", একথায় যে বিশ্বাস করতে পারে তার কোনো কথাতেই বিশ্বাস হয় না। পতিত-উদ্ধার না করতে পারলে দেশউদ্ধার কিছুতেই হবে না, কেন না দেশ হচ্ছে জড়পদার্থ আর দেশের লোক প্রাণী।

আপনি এই রকম অনেক কথা বলতে পারেন কিন্তু শোনে কে? সে যাইহোক আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে, আগে আমাদের দেশ ছিল "সোনার বাঙলা", আপনি চেষ্টায় আছেন তাকে মাটী করতে। ধরুন আপনার সে চেষ্টা সফল হোল, তাহলে বলুন ত আমরা সাহিত্যিকরা—

কি করব?

কি দেশ ধরব?

কি ছাই লিখব?

বাঁচব কি মরব দুঃখে?

বীরবল।